লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্

আহ্‌মদী

বুলেটিন

১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪ ঈসাব্দ

সম্পাদকীয়

প্রকৃত তওবা খোদার দয়াকে আকর্ষন করে

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই। ইবাদতের আবার দু'টি ধারা রয়েছে। একটি ধারা আল্লাহ্‌র হক আদায় হয় অন্য ধারাটি বান্দার হক আদায়ের। স্রষ্টার প্রতি ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং সীমাতিক্রম আমাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের দুর্বলতার সুযোগে শয়তান বাসা বাঁধে আমাদের শিরা-উপশিরায়। এথেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ তওবা ও ইস্তিগফার। বর্তমান বিশ্বের সংকট থেকে উত্তরণেরও একমাত্র পথ সামগ্রিকভাবে তওবা করা। মহান আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "এবং আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন এমতাবস্থায় যে, তুমি তাদের মধ্যে রয়েছ এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন" (৮ঃ৩৪)। এ আয়াত থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, যতক্ষণ না আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর আযাব আসতেই পারে না। অন্যদিকে যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে তওবা করি বা ক্ষমা প্রার্থনা করি ও সেভাবে প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনা করি তাহলেও বর্তমান এই দুর্ভোগ থেকে মুসলিম সমাজ তথা সারা বিশ্ব বাঁচতে পারে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন যুগের ইমামকে চেনা ও তাঁকে পূর্ণভাবে আনুগত্য করা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) বলেছেন-

"যখন বান্দা গোনাহ স্বীকার করে এবং মাফ চায় আল্লাহ্‌তাআলা কবুল করেন" (বুখারী মুসলিম)। অন্য এক হাদিসে তিনি (সঃ) বলেছেন "প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী। আর উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।

আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারছি, আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর বান্দারা অপরাধ করবে। কিন্তু যখনই প্রকৃত তওবা করে কেউ পবিত্র হতে চাইবে-তাকে ক্ষমা করা হবে এবং আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। তার মানে এই নয় যে, কেউ বার বার ইচ্ছা করে অপরাধ করতে থাকবে আর আল্লাহ্‌ও তা ক্ষমা করে দিবেন। এমনটা মনে করা ভুল। যুগ খলীফা (আইঃ) বর্তমানে আমাদের সামনে তওবা ও ইস্তিগফারের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে খুতবা প্রদান করছেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর ছত্রছায়ায় ও রহমতের ছায়াতলে আমাদেরকে স্থান দিন, আমীন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তওবা ও ক্ষমা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কিশতিয়ে নূহ পুস্তিকায় বলেন-

"সেই উৎসের পিয়াসী হও, তবে তা আপনি তোমাদের নিকট আগমন করবে। সেই দুগ্ধের জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন কর যেন, দুগ্ধ স্বতঃই স্তন হতে নির্গত হয়ে আসে। তোমরা দয়ার যোগ্য পাত্র হও, তবে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।

উদ্বিগ্ন হও, সান্তনা পাবে। পুণঃ পুণঃ ক্রন্দন কর যেন ঐশী স্নেহ-স্পর্শ এসে তোমাদের সান্তনা দেয়।"

এজন্য আমাদের উচিত শয়তান যাতে ক্রমশ তার জালে আমাদেরকে আচ্ছন্ন করতে না পারে সেজন্য প্রকৃত অর্থেই তওবা ও ইস্তিগফারের পথে অগ্রসর হওয়া।

□ ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪

বিষয় - সূচী পৃষ্ঠা নং

- কুরআন শরীফ ৩
- হাদিস শরীফ ৪
- অমৃত বাণী ৫
- **জুমুআর খুতবা ঃ** ইহসান ও অনুগ্রহের বিভিন্ন দিক
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) ৬-৮
- **জুমুআর খুতবা ঃ** জামাতী নেযামের আনুগত্য এবং এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার মধ্যেই চিরদিন বরকত নিহিত থাকবে
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) ৯-১৫
- ঐশী বাণী ১৬-১৭
- মুলাকাৎ ১৮-২০
- সীরাত ঃ হযরত আম্মাজান ২১-২২
  মূল ঃ সাহেবযাদী আমাতুশ্ শুকুর
- আহমদীয়াত ঃ ইয়ানী হাকীকী ইসলাম ২৩-২৪
  মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)
- ওকীলে আলা'র দফতর থেকে ২৫-২৬
- হযরত হুদ (আঃ) ঃ মৌঃ হেলাল উদ্দীন ২৬-২৭
- ধর্মের দৃষ্টিতে কর্ম ঃ মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয় ২৮-২৯
- আমার স্মৃতিতে তারুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঃ ডাঃ আহমদ আলী ৩০
- মধু ঃ প্রকৃতির এক মহৌষধ ঃ মোঃ ইব্রাহীম খলিল ৩১
- পবিত্র নবী সহধর্মিণীগণ (রাঃ) ঃ মূল - হাদী আলী ৩২-৩৩
- পর্দার শিক্ষা ও ব্যবহার সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার প্রধান মাধ্যম ঃ
  মোহাম্মাদ আক্রামুল ইসলাম ৩৪-৩৫
- ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ এনামুল হক রনি ৩৬-৩৯

প্রচ্ছদ ঃ ঈদুল ফিতরের সময় মসজিদে বায়তুল ফুতূহ্ (লন্ডন)-এ আহমদী সদস্যদের মাঝে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)।

ছবি ঃ ইন্টারনেট থেকে জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী সাহেবের সৌজন্যে

সূরা আত্ তাওবা-৯

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ
لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ
يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ
وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨

৮। কিভাবে (তাদের চুক্তি বিশ্বাসযোগ্য) হতে পারে। অথচ তারা তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হলে তারা তোমাদের ক্ষেত্রে কোন আত্মীয়তা১১৬০ বা চুক্তির১১৬১ ধার ধারবে না। তারা তোমাদেরকে মুখের কথায় সন্তুষ্ট করতে চায় অথচ তাদের মন এতে সায় দেয় না, আর তাদের অধিকাংশই দুষ্কর্মপরায়ণ।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ
سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩

৯। তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করেছে এবং তাঁর পথে (লোকদেরকে) বাধা দিয়েছে। নিশ্চয় তাদের কার্যকলাপ অতি মন্দ।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝١٠

১০। তারা কোন মু'মিনের১১৬২ ক্ষেত্রেই আত্মীয়তার বা অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না এবং এরাই সীমালংঘনকারী।

টীকা ঃ ১১৬০। 'ইলুন' অর্থ আত্মীয়তা বা নৈকট্য, রক্তের সম্পর্ক, সদ্বংশজাত, সন্ধি বা অঙ্গীকার, নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা (লেইন ও মুফরাদাত)।

১১৬১। 'যিম্মা' অর্থ প্রতিশ্রুতি, সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার; দায়িত্ব বা কর্তব্য, প্রাপ্য বা অধিকার, যার প্রতি কেউ অবহেলা করলে তাকে দোষ দেয়া হয় (লেইন)। 'আহ্‌লুয্ যিম্মাহ্' শব্দদ্বয় সেই সকল অমুসলিম গোষ্ঠীর জন্য ব্যবহৃত হয় যাদের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ এবং যারা রাষ্ট্রকে মাথা পিছু কর দেয়,যার বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে (লেইন)। তফসীরাধীন আয়াত অধিকতর সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যুদ্ধ ঘোষণার আদেশ কেবল এরূপ অবিশ্বাসীদের প্রতিই প্রযোজ্য যারা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুধু প্রথমেই আরম্ভ করেনি, অধিকন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকও ছিল, তারা না আত্মীয়তার মর্যাদা রাখতো, না চুক্তির শর্ত ও অঙ্গীকার রক্ষা করতো।

১১৬২। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী দুই আয়াত যুক্তি দ্বারা সেই সকল পৌত্তলিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশের যথার্থতা প্রমাণ করে (৯ঃ৫) কারণ ঃ (১) যারা ছিল কপট, বিশ্বাসঘাতক এবং নিজেদেরকে মুসলমানদের মিত্র বলে প্রকাশ করতো, কিন্তু মুসলমানরা তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা সত্ত্বেও তারা যখনই কোন ক্ষতির সুযোগ পেত, তখনই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো, (২) যারা আত্মীয়তার বন্ধনকেও উপেক্ষা করতো এবং শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে নিজেদের অতি নিকট আত্মীয়বর্গকেও হত্যা করতো (৯ঃ৮), (৩) যাদের যুদ্ধের লক্ষ্যই ছিল লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দান করা (৯ঃ৯), এবং (৪) যারা মুসলমানদেরকে প্রথমে আক্রমণ করতো (৯ঃ১৩)।

হাদীস শরীফ

উত্তম ব্যবহার

কুরআন ঃ

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

অর্থাৎ তুমি নিশ্চয় অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত (আল্ কলম ঃ ৫)।

হাদিস ঃ আন আবি দারদায়ে আনিন নাবীইয়ে (সঃ) মা'মিন শায়ইন ফীল মীযানে আসকালু মিন হুসনেল খুলকে (আবু দাউদ)।

অর্থাৎ 'আবু দারদা' (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, উত্তম আখলাক (আচার-ব্যবহার পুণ্যের দিক হতে) সবচেয়ে ওজনে ভারী (আবূ দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত আয়াতে হযরত রসূল করীম (সঃ) এর উত্তম চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বলছেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)। আজ যে উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এর বড় এক কারণ হলো তুমি উত্তম চরিত্রের ও উত্তম ব্যবহারের মার্গে উন্নীত। তাই আল্লাহ্তাআলা হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে কিয়ামতকাল পর্যন্ত মানুষের জন্যে আদর্শ করে পাঠিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি পুণ্যের ভিত্তি হলো উত্তম নৈতিকতা। এমনকি আধ্যাত্মিকতাও বস্তুত নৈতিকতার উন্নততর অবস্থা। তাই পবিত্র কুরআনে ও হাদিসে আখলাকের উপর বিষদভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম নৈতিকতার আচার-আচরণের প্রতিটি বিষয়কে বর্ণনা করেছে। বাদশাহ্ থেকে ভৃত্য পর্যন্ত প্রত্যেকের আচার-আচরণ সম্বন্ধে ইসলাম বর্ণনা করেছে। মা, বাপ, ভাই, বোন, স্ত্রী, প্রতিবেশী, শত্রু-বন্ধু জীব-জন্তু প্রত্যেকের সাথে আচার-ব্যবহারের রীতি-নীতি ইসলাম বর্ণনা করেছে। আজকের যুগে ইসলামের এই শিক্ষাকে ভুলে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের এ দুরাবস্থা, তাদের পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন অধঃপতিত। ইসলাম প্রতিটি মানবীয় গুণাবলীকে যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি ছোট ছোট পুণ্যকেও যেন অবজ্ঞা না করে তা-ও নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলছেন, হাস্যবদনে সাক্ষাত করা, রাস্তার কাঁটা সরিয়ে দেয়াও পুণ্য এবং উত্তম আচরণের লক্ষণ।

হযরত নবী করীম (সঃ) কখনও কারো হাতে হাত দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতে প্রথম করেনি, বিধবা, গরীব, মিসকীন, বৃদ্ধ ও দুর্বলদের সাহায্য করছেন। সেবকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করতেন।ছোট বড় যারই অসুবিধার কথা শুনেছেন দৌড়ে গেছেন।

মদীনাতে এক গরীব বৃদ্ধা থাকতেন, যে পুণ্যের জন্য মসজিদে নবুবী ঝাড়ু দিতেন। হযরত রসূল করীম (সঃ) কয়েকদিন যাবত তাকে না দেখে সাহাবাদের জিজ্ঞেস করেন তিনি কোথায়। ভালো তো। সাহাবা বললেন, বেচারী তো কয়েকদিন অসুস্থ থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। আপনার কষ্ট হয় বলে জানাযার খবর দেইনি।(ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের পর যখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অসুস্থ ছিলেন)। হুযূর (সঃ) অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, তাঁকে কেন খবর দেয়া হলো না। অতঃপর তিনি (সঃ) বৃদ্ধার কবরে গিয়ে দোয়া করলেন। আজ আমাদের জীবনে সীরাতে নবুবী ও তাঁর নির্দেশ পালনের প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক। তবেই আমাদের জীবন শান্তিময় ও সুখকর হবে।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে উত্তম আচার-ব্যবহার বাস্তবায়িত করার তৌফিক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ
মাওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ

"আমি সেই অস্তিত্বের শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ যে, আমি খোদাতাআলার (খোদাতাআলা একথা জানেন) তরফ হতে প্রেরিত হয়েছি।

তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উত্তম সাক্ষী যে, সেই বস্তু যা তাঁর পথে সর্বপ্রথম আমাকে প্রদান করা হয়েছে তা হলো সুষ্ঠু অন্তর অর্থাৎ এমন এক অন্তর যার প্রকৃত সম্পর্ক সম্মান ও প্রতাপের অধিকারী খোদা ব্যতিরেকে অন্য কারো সঙ্গে ছিল না। আমি এককালে যুবক ছিলাম এবং এখন বুড়ো হয়েছি কিন্তু আমি জীবনের কোন অংশেই সম্মান ও প্রতাপশালী খোদা ছাড়া অন্য কারো সাথে প্রকৃত সম্পর্ক দেখতে পাইনি। এই প্রেমোত্তাপের কারণে আমি আদৌ এমন কোন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইনি যার ধর্ম-বিশ্বাস খোদাতাআলার মাহাত্ম্য ও একত্ববাদের পরিপন্থী অথবা তাতে কোন প্রকারের অপমান অনিবার্য প্রকাশ পেতো। এই কারণেই আমি খৃষ্টধর্ম পসন্দ করতে পারলাম না কারণ এর প্রত্যেক কদমেই সম্মান ও প্রতাপের অধিকারী খোদার অপমান রয়েছে। এইরূপে হিন্দুধর্ম যার একটি শাখা হলো আর্যধর্ম, তা সত্যতার মর্যাদা হতে সম্পূর্ণ নীচে নিপতিত। তাদের দৃষ্টিতে বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুই অনাদি, যার কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, সুতরাং হিন্দুদের সেই খোদার উপর বিশ্বাস নেই, যিনি ব্যতিরেকে কোন বস্তুই বর্তমান থাকতে পারে না।

মোট কথা, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে, এই দুই ধর্ম সত্যতা ও বাস্তবতার পরিপন্থী, এবং খোদাতাআলার পথে যত প্রতিবন্ধকতার নৈরাশ্য এই দুই ধর্মের মধ্যে রয়েছে আমি সবগুলি এই পত্রিকায় লিখতে পারবো না, কেবল সংক্ষেপে লিখছি যে, সেই খোদা যাকে সকল পবিত্র আত্মা অন্বেষণ করে থাকে এবং যাকে পেলে মানুষ ইহজীবনেই মুক্তি পেতে পারে এবং তার উপর ইলাহী নূরের দুয়ার উন্মুক্ত হতে পারে এবং তার পূর্ণ মা'রেফত ও পরিচয়ের মাধ্যমে পূর্ণ মহব্বত সৃষ্টি হতে পারে, সেই খোদার দিকে এই দু'টি ধর্মই পথ প্রদর্শন করে না পরন্তু ধ্বংসের গহব্বরে নিক্ষেপ করে। এরূপে এদের অনুরূপ দুনিয়াতে আরো অনেক ধর্ম রয়েছে কিন্তু ঐ সব ধর্ম এক-অদ্বিতীয় খোদা পর্যন্ত পৌছাতে পারে না বরং সত্যান্বেষীকে গভীর তিমিরে নিক্ষেপ করে দেয়।

এগুলি ঐসব ধর্ম যেগুলিতে আমি চিন্তা করার জন্য জীবনের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করে ফেলেছি এবং পরম সততার সাথে ও গভীর দৃষ্টিতে ঐগুলির বিধি-বিধানের উপর চিন্তা করেছি এবং সবগুলিকে হক ও সত্যতা হতে অনেক দূরে অবস্থিত ও পরিত্যক্ত পেয়েছি। হ্যাঁ, এই কল্যাণময় মোবারক ধর্ম যার নাম ইসলাম এটাই এক ধর্ম যা মানুষকে খোদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। ইহাই এক ধর্ম বা মানবীয় প্রবৃত্তির প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

ইসলামের খোদা কারো উপর কল্যাণ ও আশীষের দুয়ার বন্ধ করে না বরং তাঁর দুই হাত তুলে আহ্বান জানায় যে, আমার কাছে এসো। যারা পূর্ণ শক্তির সাথে তাঁর দিকে দৌড়ায় তাদের জন্য দুয়ার খোলা হয়। সুতরাং আমি খোদার ফযল ও আশীষের সাথে নিজ কোন কলা-কৌশলে নয়, এই নিয়ামত হতে পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হয়েছি যা আমার পূর্ববর্তী নবী ও রসূলগণকে এবং খোদার মনোনীত বান্দাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই নিয়ামত পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবই ছিল না, যদি আমি আমার শিরোমণি ও মওলা নবীকুল ও মানব শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পথ অনুসরণ না করতাম। সুতরাং আমি যা কিছু পেয়েছি তাঁরই অনুসরণের বদৌলতে পেয়েছি। আমি আমার সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবহিত যে, কোন মানব এই নবী সল্লল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতিরেকে খোদা পর্যন্ত পৌছতে পারে না, এবং না পূর্ণ মা'রেফত অর্জন করতে পারে"।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়ন ১-২ পৃঃ)

অনুবাদ ঃ

আলহাজ্জ আবদুল আযীয সাদেক
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

ইহসান বা অনুগ্রহের বিভিন্ন দিক

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ,খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৯ মার্চ, ২০০৪ইং তারিখ 'বুস্তানে আহমদ' আক্রা, ঘানা(পশ্চিম আফ্রিকা)-তে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা মায়েদার ৯৪ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন। এর অর্থ নিম্নরূপ ঃ

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা যদি তাকওয়া অবলম্বন করে ও ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, আবার তারা তাকওয়া ও ঈমানে আরও উন্নতি করে পুণরায় তাকওয়া অবলম্বন করে ও অনুগ্রহ করে–তারা যা খায় তাতে তাদের কোন পাপ হবে না। আর আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"

মৌলিক চরিত্র সম্বন্ধে আমি খুতবার যে ধারা আরম্ভ করেছি এর প্রতি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টি রাখা উচিত। এ পর্যায়ে আজ 'ইহসান' বা অনুগ্রহ বিষয় বেছে নিয়েছি। বিগত জুমুআর খুতবায় আমি ন্যায়বিচার সম্বন্ধে আলোকপাত করেছিলাম। যেভাবে আল্লাহ্তাআলার আদেশ রয়েছে ঃ মু'মিন একটি গন্তব্য স্থলে গিয়ে থেমে যায় না বরং সামনে অগ্রসর হতে থাকে। তাই আমাদের লক্ষ্যস্থল কেবল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই নয় বরং আরও আগে অগ্রসর হতে হবে। একজন দুনিয়াদার লোক বলবে, সুবিচার ও ন্যায় বিচারের উচ্চ মান যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন আবার কি থেকে গেল? এতো একটা উর্ধ্বারোহণ। মানুষকে এটা লাভ করা উচিত। আর যখন এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন পার্থিব দৃষ্টিতে এথেকে অধিক পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। এ প্রসঙ্গে কাল আমি আমার বক্তব্যেও কিছু বর্ণনা করেছিলাম ঃ ন্যায় বিচারের মান এতটা উন্নীত কর যেন কোন জাতির শত্রুতাও– তোমাদেরকে 'ন্যায়বিচারের মাধ্যমে কাজ করো না' এ কথায় বাধ্য করতে না পারে যদিও এ স্থানে থেমে যাওয়াই পার্থিব দৃষ্টিতে উন্নত মান। কিন্তু পরিপূর্ণ ঈমানদারের দৃষ্টিতে এটা উন্নতমান নয় বরং এথেকে সামনেও রয়েছে আল্লাহ্তাআলার সুন্দর শিক্ষার উজ্জ্বলতা। আর ন্যায়বিচার থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ হলো অনুগ্রহ ও উপকার সাধনের পদক্ষেপ। কিন্তু স্মরণ রাখো, তোমরা এ পদক্ষেপ সেই সময় উঠানোর যোগ্য হবে যখন তোমাদের মাঝে আল্লাহ্তাআলার ভয় সৃষ্টি হবে। যখন তোমাদের মাঝে মানবমন্ডলীর জন্যে চূড়ান্ত ভালবাসা সৃষ্টি হবে আর এটা সেই সময় সৃষ্টি হয়ে থাকে যখন আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহ লাভ হয়। আর আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহ নিশ্চিত তাদের প্রতি হয়ে থাকে যারা আল্লাহ্তাআলার বন্ধু হয়ে থাকে। তারা আল্লাহ্তাআলার প্রিয়। তাদের প্রাণে রয়েছে আল্লাহ্তাআলার তাকওয়া। প্রত্যেকটি ঘটনায় বন্ধুত্ব ও প্রেমিকের অধিকার আদায় করার লক্ষ্যে তারা সেগুলোর অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ নিষেধের ওপর আমল করে থাকে। আর আল্লাহ্তাআলার আদেশ-নিষেধের মাঝে অনুগ্রহ করাও একটি বড় আদেশ ও গুণের অন্তর্ভুক্ত।

এখন এ আয়াতে, যা আমি তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহ্তাআলা মু'মিনের একটি বড় চিহ্ন বর্ণনা করেছেন। সে অনুগ্রহকারী হয়ে থাকে আর আল্লাহ্তাআলা অনুগ্রহকারীকে অনেক ভালবাসেন।

নিজেদের নিকটবর্তী লোকদের সাথে কখনও কখনও যেভাবে ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ ছাড়া সদাচরণ করে থাক যেভাবে তোমরা নিজেদের স্ত্রী, সন্তানাদি, ভাই-বোন বা নিকটবর্তী বন্ধুদের সাহায্য করে থাক আর নিঃস্বার্থভাবে করে থাক, সেভাবেই আল্লাহ্তাআলার অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সদাচরণ কর, তাদের সাথে অনুগ্রহের আচরণ কর।

কিন্তু তিনি বলেছেন, অনুগ্রহ করার এ গুণ এমনিতেই সৃষ্টি হয়ে যায় না। এ জন্যে তাকওয়া অবলম্বন করার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে, আল্লাহ্তাআলার হয়ে যাওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ তাকওয়ার উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়গুলো অতিক্রম করা আবশ্যক। এখন আমি এসব পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনায় যাব না যদিও আল্লাহ্তাআলা এ আয়াতে তাকওয়ার ৩টি পর্যায় সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন তোমরা এ সীমা পর্যন্ত তাকওয়া অবলম্বন করবে তখন তোমরা অনুগ্রহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

স্মরণ রাখো, সবাই আল্লাহ্তাআলার প্রিয় ব্যক্তি হতে চায়। আল্লাহ্তাআলা তার বন্ধু ও অভিভাবক হন। আল্লাহ্তাআলা সব সংকটে তাকে উত্তরিয়ে দেন। তাই যখন তোমরা নিজেদের তাকওয়ার মানকে সেই সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাবে যেন অনুগ্রহপ্রাপ্তকারীতে পরিণত হতে পার। আবার তোমরা আল্লাহ্তাআলার প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে এবং যে আল্লাহ্তাআলার প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যায় তাকে পৃথিবীর কোন শক্তি ক্ষতি করতে পারে না।

আবার কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্তাআলা অনুগ্রহের বিভিন্ন আকার বর্ণনা করেছেন। কোথাও বলেছেন, আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর আর এটাও অনুগ্রহ করা। কিন্তু এটা খোদাতাআলার প্রতি অনুগ্রহ নয় বরং এটা তোমাদের নিজেদের প্রতি অনুগ্রহ যেন আল্লাহ্তাআলা এর কারণে তোমাদেরকে অনেক বিপদ-আপদ থেকে সুরক্ষা করেন।

আল্লাহ্তাআলা পুণরায় অন্য একটি স্থানে বলেছেন, নিজেদের নিকটবর্তী লোকদের সাথে কখনও কখনও যেভাবে ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ ছাড়া সদাচরণ করে থাক যেভাবে তোমরা নিজেদের স্ত্রী, সন্তানাদি, ভাই-বোন বা নিকটবর্তী বন্ধুদের সাহায্য করে থাক আর নিঃস্বার্থভাবে করে থাক, সেভাবেই আল্লাহ্তাআলার অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সদাচরণ কর তাদের সাথে অনুগ্রহের আচরণ কর। তাদের কাজে আস, যে জিনিস নিজেদের জন্যে পসন্দ কর তাদের জন্যেও তা পসন্দ কর; আর আল্লাহ্তাআলা তোমাদেরকে একটি কল্যাণে মন্ডিত করেছেন। তোমাদেরকে এ যুগের ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ আলায়হেস সালামকে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন। নিজেদের স্বজাতিকেও এ আলো ব্যাপকভাবে দেখানোর চেষ্টা কর। এটাও হবে তাদের ওপর তোমাদের অনুগ্রহ। প্রত্যেক পবিত্র আত্মাকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পতাকা তলে নিয়ে এস। তাহলে এটাও হবে জাতিগুলোর ওপর তোমাদের অনুগ্রহ ও উপকার সাধন। আর তোমরা আল্লাহ্তাআলার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু এটাও স্মরণ রাখুন, নিজেদের অন্তর্ভূক্ত করে পুনরায় এ সম্পর্ক ছিন্ন হতে দিবেন না বরং এর সাথে সুদৃঢ় যোগাযোগ এবং সম্পর্কও রাখতে হবে। তাই এ চিন্তার সাথে প্রত্যেক আহমদীকে অনুগ্রহের উন্নততর গুণকে পৃথিবীতে প্রকাশ করতে হবে।

এখন এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি। একটি দীর্ঘ হাদীস রয়েছে। এতে হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মজলিসে জিব্রাঈল (আঃ) এসে ইসলাম, ঈমান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। আর এতে 'ইহ্সান' বা অনুগ্রহ সম্পর্কেও প্রশ্ন করেন। ইহসানের সাথে সম্পর্কিত অংশ সম্বন্ধে বলছি। প্রশ্ন ছিল, ইহসান সম্বন্ধে কিছু বলুন। তিনি (সঃ) বলেন, "তুমি আল্লাহ্তাআলার এমনভাবে ইবাদত কর যেন তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ আর তোমার এ পদ যদি লাভ না হয়ে থাকে তাহলে কমপক্ষে এ চিন্তা ও অনুগ্রহ যেন থাকে, আল্লাহ্তাআলা তোমাকে দেখছেন। এটাই হলো ইহসান"(বুখারী, কিতাবুল ঈমান)।

অতএব আহমদীদের নিজেদের নামায আদায়কালীন সব সময় এ নীতি নিজেদের সামনে ও দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। প্রত্যেক আহমদী যখন এভাবে নামায আদায়কারী হয়ে যাবে, কেবল মাথা থেকে বোঝা নামানোর ন্যায় নামায পড়বে না, **এ চিন্তার সাথে যখন নামায আদায় করা হবে যেন আল্লাহ্তাআলার সমীপে উপস্থিত হয়েছে, সব দৃষ্টি ও ধ্যান তাঁর দিকেই, তখন দেখুন কিভাবে বিপ্লব সাধিত হয়।**

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন ঃ

"খোদাতাআলার সাথে যে পবিত্র সম্পর্ক করা হয় এটা পুণ্য। আর তাঁর ভালবাসা নিজস্ব ধমণী ও শিরায়-শিরায় প্রবাহিত হতে থাকে। যেভাবে খোদাতাআলা বলেছেন- [ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা] অর্থাৎ আল্লাহ্ নিশ্চয় ন্যায়বিচার ও উপকার সাধন করার ও আত্মীয়-স্বজনকে (দান করার ন্যায় অন্য লোকদেরকে) দান করার আদেশ দিচ্ছেন- ১৬ঃ৯১। খোদাতাআলার সাথে আদল বা ন্যায়বিচার এই ঃ তাঁর অনুগ্রহ ও পুরস্কার স্মরণ করে তাঁর প্রতি অনুগত হয়ে থাক আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করো না এবং এগুলো চিনে নাও। এতে উন্নতি করতে চাও তো ইহসানের মান ও মর্যাদা লাভ কর। আর ইহসান হলো ঃ তাঁর সত্তাতে এমন দৃঢ়-বিশ্বাস রাখ যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যেসব লোক তোমার সাথে সদাচরণ করেনি তাদের সাথে সদাচরণ কর। এর চেয়ে যদি উন্নত স্তরের সদাচরণ পেতে চাও তাহলে আরও একটি পুণ্যের স্তর রয়েছে আর তা এই; খোদাকে ভালবাস–স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে ভালবাস। বেহেশ্তের লোভ-লালসায় নয় আর দোযখের ভয়েও নয় বরং যদি মনে করে নেয়া হয়, বেহেশ্তও নেই আর দোযখও নেই, তখনও ভালবাসার আবেগ ও আনুগত্যে ইতরবিশেষ যেন না হয়। আর এ রকম ভালবাসা যখন খোদার সাথে সৃষ্টি হয় তখন এতে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়, কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে না" (আল্ বদর, ২য় খন্ড, নম্বর ৪৩, ১৬/২/১৯০৪ পৃষ্ঠা ৩৩৫)।

আবার একটি হাদীস আমি উপস্থাপন করছি। এতে দেখুন, আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে কী আশা পোষণ করতেন। উত্তম স্বভাবের কোন উচ্চ স্থানে আমাদেরকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

"হযরত হুযায়েফা (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অন্যান্যদের দেখাদেখি এমন বলবে না, লোকেরা আমাদের সাথে সদাচরণ করলে আমরাও তাদের সাথে সদাচরণ করবো আর তারা আমাদের ওপরে যুলুম অত্যাচার করলে আমরাও তাদের ওপর যুলুম অত্যাচার করবো বরং তোমরা তোমাদেরকে এমনভাবে তরবিয়ত করো যেন লোকেরা তোমাদের সাথে সদাচরণ করলে তোমরা তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করো। তারা যদি তোমাদের ওপর যুলুম-অত্যাচার করে তাহলেও তোমরা তাদের ওপর যুলুম-অত্যাচার করবে না" (তিরমিযী, কিতাবুল বির্র ওয়াস্সিলাহ্)।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন–"আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ৩টি কথা এমন রয়েছে যা কারও মাঝে পাওয়া গেলে আল্লাহ্তাআলা তার ওপর নিজের দয়ার আঁচল বিছিয়ে দেবেন আর তাকে বেহেশ্তে প্রবিষ্ট করিয়ে দেবেন। প্রথম দুর্বলদের প্রতি দয়া করা, দ্বিতীয় পিতামাতাকে ভালবাসা ও করুণা দেখানো, তৃতীয় খাদেম ও চাকরদের প্রতি ইহসানপূর্ণ আচরণ করা।"

দেখুন কত সুন্দর শিক্ষা! প্রত্যেকেই এখন নিজ নিজ হিসাব নিন। ভয় হয়, আমরা কি এ অবস্থান লাভ করতে পেরেছি! আদেশ তো এই ঃ তোমাদের সাথে সাধারণ শিষ্টাচার দেখালে তোমরা তাদের সাথে অনুগ্রহের আচরণ কর। তোমাদের সাথে কেউ যে পরিমাণ পুণ্য আচরণ করেছে তোমরা এর চেয়ে অধিক পুণ্য আচরণ কর। আর এখানেই ইতি টানা ঠিক নয়। আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমাদের সাথে কেউ অসদাচরণ করলেও তোমরা তাদের সাথে যুলুম-নির্যাতন করবে না। ক্ষমা করতে যদি না পার তাহলেও এতটা প্রতিশোধ নিও না যেন অত্যাচারীতে পরিণত হও।

আবার আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ইহসানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা আছে। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন– "আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার প্রতি কোন ইহসান করা হয়েছে আর সে ইহসানকারীকে বলে, জাযাকাল্লাহু খয়রান অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা তোমাকে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দিন তখন সে শোকরিয়া আদায় করার চূড়ান্ত করে দিয়েছে" (তিরমিযী, কিতাবুল বির্রওয়াস্ সিলাহ্)।

অতএব একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, ইহসানকারীকে কেবল আনুষ্ঠানিক 'জাযাকাল্লাহ্' বলা যথেষ্ট নয় বরং এটা এমন এক দোয়া যা তোমাদের অন্তর থেকে বের হওয়া উচিত। কেননা, ইহসানকারীর ইহসান স্বীকার করার পর তার ইহসানের তখনই মূল্যায়ন হতে পারে যখন তোমাদের প্রাণ থেকে কৃতজ্ঞতার ধ্বনি বের হয় আর তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এমন দোয়ার সৌভাগ্য দিন যাতে পবিত্র সমাজ ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়।

পুণরায় হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন–"আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ৩টি কথা এমন রয়েছে যা কারও মাঝে পাওয়া গেলে আল্লাহ্তাআলা তার ওপর নিজের দয়ার আঁচল বিছিয়ে দেবেন আর তাকে বেহেশ্তে প্রবিষ্ট করিয়ে দেবেন। প্রথম দুর্বলদের প্রতি দয়া করা, দ্বিতীয় পিতামাতাকে ভালবাসা ও করুণা দেখানো, তৃতীয় খাদেম ও চাকরদের প্রতি ইহসানপূর্ণ আচরণ করা।"

আবার হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেন– নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুসলমানদের ঘরের মাঝে উত্তম ঘর সেটি–যাতে এতীম থাকে আর এর প্রতি ইহসানপূর্ণ আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের ঘরের মাঝে নিকৃষ্ট ঘর সেটি, যাতে এতীমের সাথে অসদাচরণ করা হয়" (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল আদাব)।

আমার এ ধারণা রয়েছে, খোদা করুন, এ ধারণা সঠিক হোক। এখানে এদেশে (ঘানা) সাধারণত নিজের ভাই-বোন ও এতীম শিশুর উত্তমভাবে প্রতিপালন করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ করুন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দোয়াসমূহ এসব মু'মিনের পক্ষে পূর্ণ হোক যারা এতীমের সাথে ইহসানপূর্ণ আচরণ করেন। আর কোন আহমদীর ঘর এ কর্তব্য পালন না করে কখনও যেন নিকৃষ্ট ঘরের অন্তর্ভুক্ত না হয়। আল্লাহ্ করুন সারা বিশ্বের প্রত্যেক আহমদী ঘরে এতীমদের প্রতিপালনের উত্তম চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কখনও ইহসান ও উপকার করে উপকারের খোঁটা দানকারী যেন সৃষ্টি না হয় এবং পুণ্য কর্ম করে সাগরে ঢেলে দাও অর্থাৎ কোন পুন্য করেছ তা-ও ভুলে যাও–এ বাক পদ্ধতির ওপর আমলকারী হয়।

আবার এতীম শিশুদের সাথে সদাচরণকারীদেরকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আরও একটি সুসংবাদও দিয়েছেন। হযরত আবূ আমামাহ্ বর্ণনা করেন, নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"এতীম বালক ও বালিকাদের মাথায় কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে যে-ব্যক্তি স্নেহের হাত বুলায় তার প্রত্যেকটি চুলের জন্যে, (যার ওপর তার স্নেহের হাত বুলিয়েছে) পুণ্য গণনা করা হবে। আর যে-ব্যক্তি নিজের লালন-পালনের অধীনে এতীম বালক ও বালিকাদের প্রতি সদাচরণ করেছে সে আর আমি বেহেশ্‌তে এমন থাকবো [তিনি (সঃ) নিজের দুটি আঙ্গুল একত্র করে দেখান]" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫০, বৈরুত)।

অতএব জান্নাতে যার আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য লাভ হয় তার আর কিই বা চাই?

আবার মহিলাদের সাথে সদাচরণের প্রসঙ্গে কিছু বর্ণনা করছি। হযরত আকদস মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামের একটি উদ্ধৃতি এই ঃ "পুরুষকে নারীর তুলনায় প্রাকৃতিক শক্তি অধিক দেয়া হয়েছে। এ কারণেই পৃথিবী সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল থেকে পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ব করে এসেছে। আর পুরুষের স্বভাবে যতটা আস্থাশীলতার সাথে চূড়ান্ত শক্তির পুরস্কার দেয়া হয়েছে তা নারীর শক্তিতে দেয়া হয়নি। কুরআন শরীফে এ আদেশ রয়েছে, পুরুষ যদি নিজের স্ত্রীকে পৌরুষ ও ইহসানের আলোকে সোনার পাহাড়ও দেয় তাহলে পরীক্ষার অবস্থায় যেন ফিরিয়ে না নেয়। এথেকে প্রকাশিত হয়, ইসলামে নারীকে কতটা সম্মান দেয়া হয়েছে। এক অর্থে তো নারীকে পুরুষের চাকরানী মনে করা হয়েছে। আর যদিও পুরুষের জন্যে কুরআন শরীফে এ আদেশ-আশীরূহুন্না বিল মা'রূফ অর্থাৎ তোমরা নারীদের সাথে এমন সদাচরণের মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি কর যেন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ইহ্‌সান ও পৌরুষের সাথে আচরণ করে থাকা" (চশমাহ্ মা'রেফত, রূহানী খাযায়েন, ২৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮)।

আবার পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখার প্রসঙ্গে হযরত মসীহে মাওউদ(আঃ) বলেন ঃ

"আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন, আর খুব কষ্টে মা তাঁকে নিজের পেটে ধারণ করেছেন এবং কষ্টের সাথেই তাকে জন্ম দিয়েছেন। এ কারণে আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি। আর এ কষ্ট এতটা সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যে, এর পেটে থাকা ও এর দুধ ছাড়াতে ৩০ মাস পর্যন্ত গিয়ে শেষ হতো। এমন কি যখন একজন পুণ্যবান মানুষ নিজের পূর্ণ শক্তি লাভ করে তখন দোয়া করে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে তুমি তোমার দেয়া অনুগ্রহের শোকরিয়া আদায় করার সৌভাগ্য দাও আর আমি এমন কোন সৎকর্ম করি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও এরও শোকরিয়া আদায় করার সৌভাগ্য দাও ...।" (চশমাহ মা'রেফত, রূহানী খাযায়েন ২৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৯ হাশিয়া)।

প্রথমে সৎ কর্ম করাতে তোমরা ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখো। যে-ব্যক্তি তোমার সাথে পুণ্য আচরণ করে তুমিও তার সাথে পুণ্য আচরণ কর। আর দ্বিতীয় স্তর এই ঃ তোমরা এর চেয়েও এগিয়ে সুন্দর আচরণ কর। এটাই ইহসান বা অনুগ্রহ। ইহসানের স্তর যদিও ন্যায় বিচারের উর্ধ্বে আর খুবই উচ্চ স্তরের পুণ্য কিন্তু কখনও না কখনও সম্ভবত ইহসানকারী নিজের ইহসানের খোঁটা দিবে। কিন্তু এসব থেকেও উচ্চ আর একটি স্তর রয়েছে, মানুষ এমন পদ্ধতিতে পুণ্যকর্ম করে যা ব্যক্তিগত ভালবাসার আকারে হয়ে থাকে। এতে ইহসান প্রদর্শনের কোনই অংশ থাকে না। যেভাবে মা নিজের সন্তানকে লালন-পালন করে থাকেন। এ লালন-পালনের জন্যে তিনি কোন প্রকার প্রতিদান ও প্রশংসার প্রত্যাশী হন না। বরং প্রারম্ভিক আবেগে সন্তানের জন্যে নিজের সব সুখ ও আরাম বিসর্জন দিয়ে দেয়।

আমাদের কোন কাজ কখনও যেন এমন না হয় যাতে কোন দিক থেকে কোন আহমদীর ওপর অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলা হয়, এ অসদাচারী ও অনুগ্রহ ভুলে গেছে।

আমরা ইহসানের উচ্চ গুণকে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে পারি আল্লাহ্‌তাআলা যেন আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দেন। আর অন্তরের গভীর থেকে যেন এ গুণের প্রকাশ ঘটাতে পারি। আমাদের কোন কাজ কখনও যেন এমন না হয় যাতে কোন দিক থেকে কোন আহমদীর ওপর অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলা হয়, এ অসদাচারী ও অনুগ্রহ ভুলে গেছে। আজকের খুতবা আমি এখানে এজন্যে উর্দূতে দিয়েছি কেননা, পাকিস্তানের নির্যাতনমূলক আইন যুগ-খলীফার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং খলীফা ইসলামের শিক্ষা জামাতকে দেয়ার অধিকার রাখে না। অথবা অন্য কথায় পাকিস্তানী আহমদীকে নিবর্তনমূলক আইনের কারণে যুগ-খলীফার আহ্বান শুনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু এ দুনিয়াদারদের কি জানা আছে, আল্লাহ্‌তাআলার কার্মকান্ড তাদের কর্মকান্ড থেকে অনেক উচ্চ। আর তারা যুগ -খলীফার কথা এক দেশে বন্ধ করে দিয়েছে আল্লাহ্‌তাআলা এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে এ আহ্বান পৌছে দিয়েছেন। এ খুতবাও এখান থেকে সারা বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে। যদিও পাকিস্তানী আহমদীদের অধিকারও রয়েছে এবং এ ইহসানের শোকরানা চাহিদা ও যা পাকিস্তানী মুবাল্লেগীন বিশ্বের এ অংশে আহমদীয়ত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌছিয়ে করেছেন। অতএব ইহসানের শোকরিয়া আদায় করতে গিয়ে যেখানে এসব মুবাল্লেগের জন্যে আমাদের দোয়া করা উচিত যারা প্রাথমিককালে আহমদীয়ার বাণী নিয়ে এখানে এসেছিলেন তাদের ভবিষ্যত বংশধর ও জাতির জন্যেও এ বলে দোয়া করা উচিত ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে বিরুদ্ধবাদীর প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা করুন এবং তাদেরকেও স্বাধীনতার দিন দেখার সৌভাগ্য দিন যেন তারা আপনাদের মত জলসা অনুষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জন করে।

আমি এখানকার সরকারের বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির এবং লোকদের প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ আহ্বানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং জাযাকুমুল্লাহু খয়রান বলছি। আর এটাই সবচেয়ে বড় দোয়া। আর সবচেয়ে অধিক অন্তরের আবেগ নিয়ে আমি নিজের প্রিয় সব আহমদী ভাই ও বোনকে দোয়া দিচ্ছি, যারা আল্লাহ্‌তাআলার রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশ পালন করতে গিয়ে এ যুগের ইমামের বয়আত করেছেন। আর কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে তার খলীফার সাথে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ভালবাসার উচ্চ স্তর প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের ঈমান, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মান আরও উন্নতি করতে থাকুন। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদেরকে ইসলামের এ সুন্দর শিক্ষা বিশ্বের এ অংশে বিস্তার দানের সৌভাগ্য দান করুন।

আজ ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা জুমুআর পর এ জলসা সমাপ্ত হবে। এ দু'দিনে আপনারা যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন আপনাদের জীবনে তা অংশ বানাবার সৌভাগ্য আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদেরকে প্রত্যেক সংকট ও প্রত্যেক অস্থিরতা থেকে সুরক্ষা করুন। আল্লাহ্‌তাআলা ভালভাবে আপনাদেরকে ঘরে নিয়ে যান। সফরে সব দিক থেকে হাফেয ও নাসের হোন আর আমার কাছে সবদিক থেকে সব রকমের আনন্দের সংবাদ আসতে থাকুক। আর আমার এ সফর যা বিভিন্ন দেশে প্রায় মাসখানেক ধরে অব্যাহত থাকবে তা যেন আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য-সমর্থনে ও তাঁর অনুগ্রহমন্ডিত হয়ে নিজ সমাপ্তিতে পৌছে। আল্লাহ্‌তাআলার জামাতের উন্নতির সব স্তর অতিক্রম করতে আমরা যেন দেখতে পারি, আমীন।

(এ খুতবার সাথে সাথে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করার সৌভাগ্য, মোকাররম আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেব, আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, ঘানা লাভ করেন)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৬-২২ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখের সৌজন্যে)।

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

জামাতী নেযামের আনুগত্য এবং এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার মধ্যেই চিরদিন বরকত নিহিত থাকবে।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ২৭ আগষ্ট, ২০০৪ইং তারিখে নতুন মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহার পর হুযূর (আইঃ) সূরা নিসা'র ৬০ নং আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা এরশাদ করেছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

অনুবাদ ঃ "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দানের অধিকারী। তারপর তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতভেদ কর তাহলে তোমরা তা আল্লাহ্ এবং এ রসূলের প্রতি সমর্পন কর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। এটা বড়ই কল্যাণকর এবং পরিণামের দিক থেকে অতি উত্তম।"

কোন জামাতের উন্নতির মাপকাঠি এবং অগ্রগতি নির্ভর করে সে জামাতের বা জাতির আনুগত্যের উপরে। যখনই আনুগত্যে ভাটা পড়বে তখনই অগ্রগতিও ব্যাহত হবে। তারপর, ঐশী জামাতের ক্ষেত্রে কেবল এর অগ্রগতিতে ব্যাহত হবে না বরং এর আধ্যাত্মিক উন্নতিও বাধাগ্রস্ত হবে। এজন্যই আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন শরীফে বার বার আনুগত্যের বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন আঙ্গিকে মো'মেনগণকে নসীহত করেছেন যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা হবে তখন যখন রসূলের আনুগত্য করা হবে। কখনো বলা হয়েছে, তোমাদের ক্ষমা লাভের উপায় এই যে, তোমরা খোদা ও রসূলের আনুগত্য কর, সকল আদেশ মেনে চল, তবে ক্ষমা লাভ হবে। আবার বলেছেন, তাকওয়া লাভও তখন হবে যখন তোমরা আনুগত্য করবে, বা তোমরা কেবল তখনই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে যখন তোমরা আনুগত্যকারী হবে। তোমরা যখন আনুগত্যের মানকে সমুন্নত করবে তখন তোমরা আমাদের জান্নাতের ওয়ারীশ হবে।

এভাবে আনুগত্য সম্পর্কে মোমেনদেরকে আরো অনেক আদেশ দেয়া হয়েছে।

যে আয়াত শুরুতে আমি তেলাওয়াত করেছি, এতে আনুগত্যের বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যারা দাবী কর যে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছি; তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। সাথেই বলা হয়েছে, তোমাদের কর্মকর্তাদের (ওয়াহ্‌দাদার) আনুগত্য কর, আমীরের আনুগত্য কর, যে নেযাম

তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে সে নেযামের আনুগত্য কর। অনেকে বলে বসে যে, 'মতভেদ সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাছে বিষয়টিকে পেশ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মতভেদ দেখা দিলে কুরআন ও হাদীস দেখতে বলা হয়েছে। সেখানে দেখ, যে কি আদেশ দেয়া হয়েছে। (স্মরণ রাখবেন) এর অর্থ এই না যে, যে কেউ নিজের ইচ্ছা মত, বিদ্যা বুদ্ধি থাক বা না থাক, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে শুরু করবে। প্রথম কথা এই যে, সমস্ত বিষয়, সমস্ত আদেশ-নিষেধ এবং সকল নির্দেশের ব্যাখ্যা বা তফসীর সকলে জানে না; অনেক বিষয় এমন আছে যার বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়; এ সমস্ত বিষয়ে কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতি এবং সে সবগুলোর ব্যাখ্যা সে বিষয়ে যারা বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাদের কাছ থেকে জানা প্রয়োজন হবে, তাদের কাছে যেতে হবে।

আল্লাহ্‌তাআলা অন্ধকার (গত এক হাজার বছর) যুগেও মুফাস্‌সেরীন ও মুজাদ্দেদীন সৃষ্টি করেছিলেন যারা ধর্মের গভীর জ্ঞান রাখতেন। তারা নিজ নিজ এলাকার মানুষকে দিক নির্দেশনা দিতেন। কিন্তু বর্তমান যুগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর যুগ, আল্লাহ্‌তাআলা তাকে হাকামান আদালান বানিয়েছেন, [ন্যায় বিচারক ও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী] বর্তমান যুগে কুরআনে মজিদ ও আঁ-হুযূর (সঃ) এর নির্দেশাবলীর সহী জ্ঞান ও বুঝ (প্রজ্ঞা) দান করেছেন। এ যুগে কেবল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে সহী জ্ঞান দান করা হয়েছে। অতএব, শরীয়তের কোন নির্দেশ সম্পর্কে তিনি যে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন সেটিই সহী হবে। কারণ তাকে তো স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা শিখিয়েছেন। সুতরাং আমরা বড়ই ভাগ্যবান যারা এ যুগে জন্মেছি এবং আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করা হয়েছে অথচ ইতিপূর্বে অনেক বিষয়ে মানুষেরা বহু বিতর্কে লিপ্ত ছিল। আজ ফারুদ্দুহো ইলাল্লাহে ওয়ার রাসূলে এর উপর আমল করা সহজ করে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ সমস্ত মা'রেফত এবং এসব মাসায়েল বুঝাবার জন্য সীমাহীন জ্ঞান ভান্ডার দান করে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ্‌তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমাদের মধ্যে এমন এক নেযাম জারী করে দিয়েছেন যদ্বারা প্রত্যেক সমস্যার সমাধান এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) এর আদেশ নিষেধ বুঝবার সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এজন্য আমরা আল্লাহ্‌র যতবেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তা কম হবে। তিনি আমাদের ঈমানকে আরো শক্তিশালী করেছেন এবং আমাদের শেষ পরিণতি ভাল করে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হাকামান আদালান এর আনুগত্যের শুভ ফলের

সুসংবাদ দিয়েছেন। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পরে আল্লাহ্‌র দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুদরতে সানীয়ার দ্বিতীয় শক্তির বিকাশ তথা আহমদীয়া খেলাফতের যে নেযাম জারী হয়েছে, এর পুরোপুরি আনুগত্য করা আমাদের জন্য অবশ্যই ফরয করা হয়েছে। আমাদের উচিত, এ নেযামের প্রতি আমাদের আনুগত্যের মান যেন দিনদিন উন্নত হতে থাকে। তবে মনে রাখবেন, আনুগত্যের মান উন্নত করতে বড় বড় কুরবানির [ত্যাগ স্বীকারের] প্রয়োজন হয়, ধৈর্যেরও প্রয়োজন হয়। তারপর যারা জাগতিকভাবে ক্ষমতার অধিকারী জাগতিক বিষয়ে তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করাও আবশ্যক। যে কোন সরকার তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে সমস্ত আইন-কানুন বানিয়েছে সেগুলো মান্য করাও আবশ্যক। আপনারা যে দেশে বসবাস করছেন সে দেশের আইন-কানুন আপনাদেরকে মেনে চলতে হবে। তবে সে আইন যেন ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে না হয়-ধর্মের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ না হয়, যেমন পাকিস্তানে হয়েছে। আহমদীদের জন্য সেখানে এমন কতক আইন বানানো হয়েছে। কিন্তু সেদেশেও তাদের আইন মেনে চলতে হবে যা সে দেশের সরকার তাদের দেশ চালাবার জন্য বানিয়ে রেখেছে। ধর্মের বিষয় মানুষের অন্তরের বিষয়। এমন তো হতে পারে না যে, আইন আপনাকে নামায পড়তে নিষেধ করবে আর আপনিও নামায ছেড়ে দেবেন। সুতরাং যে কোন নেযাম, তা জাগতিক, রাষ্ট্রীয় বা সরকারী নেযাম হোক অথবা ধর্মীয় নেযাম হোক, বা জামাতের নেযাম- এতদুভয় নেযামকে মেনে চলতে হবে। কেবল এমন আইন যা সরাসরি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) এর নির্দেশের বিপরীত তার ব্যতিক্রম রয়েছে। ধর্মীয় দিক থেকে আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে অন্যদের চিন্তার কারণ থাকতে পারে আমাদের আহমদীদের কোন চিন্তার কারণ নাই। কারণ আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে মান্য করেছি। অতএব, এখন আমরা এ সমস্ত চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছি। আমরা নিশ্চিত যে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) এর নির্দেশ মেনে চলেছি। যে সমস্ত বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সে সব বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এভাবে তোমরা আমল করতে থাক।

আমি উপরে বলেছি, যে সমস্ত বিষয়ে মানুষ মতভেদ করে ওলামা, মুফতীয়ান, মুফাস্‌সেরীনদের কাছে যায় সে সব বিষয়ে প্রত্যেকে (আলেম বা মুফতী) নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক অনুসারে সমস্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। নিজ থেকে তাঁরা সততার সাথে এ কাজ করেছেন। কিন্তু আস্তে আস্তে কালক্রমে যে সমস্ত বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন সেদিক নজর করে মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং এভাবেই বিভিন্ন ফেরকার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। লড়াই ঝগড়া হয়েছে। এভাবে ফেরকাবাজীর কারণে মুসলমানরা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আবির্ভূত হয়েছে।

চিরদিন স্মরণ রাখবে, তোমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে, 'আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা।' এবং এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) এবং জামাতের নেযামের সব আদেশ নির্দেশ মেনে চলতে হবে। নেযামের নিয়ম-কানুন ও তাদের সিদ্ধান্তকে মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য যেন কোন অবস্থাতেই প্রশ্নবিদ্ধ না হয়।

এবার এ বিষয়ে কতিপয় হাদিস পেশ করছি। হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে; যে আমার অবাধ্য হয় সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়। যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্য হয় সে আমার অবাধ্য হয়।" (সহী মুসলিম কিতাবুল এমারত)।

ঐ একই ধারাবাহিকতা চলছে। বলেছেন, 'আনন্দবোধ কর বা কষ্টবোধ কর- আমীরের আনুগত্য কর তার সাথে বিবাদ কর না। তার সিদ্ধান্তকে মেনে চল। তারপর বলা হয়েছে যে, সত্যের উপর কায়েম থাক। এর অর্থ কেউ যেন মনে না করে যে, 'আমি সত্যের উপর কায়েম আছি- থাকব- সুতরাং আমীরের আদেশ মানব না।' বরং অর্থ এই যে, 'তোমরা সব সময় যেন সত্য কথাটাই বল, পৃথিবীর কোন লোভ-লালসা, চাপ, কঠোরতা, তোমাকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে না পারে। তোমার নিজের কোন বিষয়ও যদি সামনে আসে তবুও সত্য বলবে, সত্য সাক্ষ্য দিবে। মিথ্যা বলে নেযামের বিপক্ষে বা কারো বিপক্ষে লড়াই-ঝগড়া করবে না। কখনও একথা ভাববে না যে, 'আমরা যদি নেযামের কথা মেনে নিয়ে বা ভাই বা বন্ধু বান্ধবের কথা মেনে নিয়ে আপোস করে (বিবাদ মিমাংসা) সত্য হয়ে মিথ্যাবাদীর ন্যায় নতি স্বীকার করি তাহলে মানুষ কি বলবে!'

চিরদিন স্মরণ রাখবে, তোমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে, 'আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা।' এবং এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) এবং জামাতের নেযামের সব আদেশ নির্দেশ মেনে চলতে হবে। নেযামের নিয়ম-কানুন ও তাদের সিদ্ধান্তকে মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য যেন কোন অবস্থাতেই প্রশ্নবিদ্ধ না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার উর্দ্ধতন কর্মকর্তার মাঝে কোন মন্দ কিছু দেখে তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ জামাতের নেযাম থেকে সামান্য পরিমাণও যদি সে পৃথক হয়ে সরে যায়-তবে তার মৃত্যু জাহেলিয়তের মৃত্যু হবে।" [সহী মুসলিম,. কিতাবুল এমারত]।

অনেকে এমন করে যে, লোকদের সামনে বলে বেড়ায় যে, জামাতের নেযাম একটি ব্যাপারে আমার বিপক্ষে অপর পক্ষে রায় দিয়েছে, কিন্তু দেখ আমি ধৈর্য ধরেছি। কিন্তু সিদ্ধান্ত বা রায় ঠিক ছিল না। আমি মেনে নিয়েছি যদিও সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। মানুষের মাঝে এভাবে কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে বেড়ালে ধৈর্য হয় না। ধৈর্য এই যে, আপনি চুপ থাকবেন, সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না। হ্যাঁ আপনার কষ্টের কথা আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করুন। এমন হতে পারে যে, যে মজলিসে এমন আলোচনা করা হয় সেখানে এমন লোক থাকতে যে পরবর্তীতে এ রকম কথাকে অন্যদের মধ্যে বলে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে নেযামের সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দিতে পারে এবং অনেক সময় বড় রকম ফেৎনা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। যারা এ

ধরনের ফেৎনার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়বে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা জাহেলিয়তের মৃত্যুবরণ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের কাছে কি আশা করেন? হযরত (আঃ) লিখেছেন ঃ

"আনুগত্য করা কি সহজ কাজ? যে ব্যক্তি পুরোপুরি আনুগত্য করে না সে এ জামাতের বদনাম করে। আদেশ-নিষেধ তো একটি হয় না, আদেশ নিষেধ তো অনেক আছে। বেহেস্তের যেমন অনেকগুলো দরজা আছে, কেউ কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে কেউ অন্য কোন দরজা দিয়ে। জাহান্নামেরও তেমনই অনেক দরজা আছে। এমন যেন না হয় যে, তোমরা জাহান্নামের এক দরজা বন্ধ কর কিন্তু অপর দরজা খোলা রাখ।" (মলফুযাত, ২য় খন্ড; ৪১১ পৃষ্ঠা)।

মানুষে মুখে তো সবাই বলে যে, আমি আনুগত্য করি, জামাতের যে কোন নির্দেশ আমরা অবশ্যই মেনে চলি। কিন্তু যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, নিজের স্বার্থের বা নিজের কিছু অধিকার ছাড়তে হয় তখন বোঝা যায় যে আনুগত্য আছে বা নাই। এ জন্যই হযরত (আঃ) বলেছেন, আনুগত্য করা সহজ কাজ নয়। প্রত্যেক আদেশ মেনে চলা, প্রত্যেক কথার আনুগত্য করা চাই। হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন, ' যে ব্যক্তি পুরোপুরি আনুগত্য করে না সে জামাতকে বদনাম করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অধিকারসমূহ আদায় করে না (ইবাদত ইত্যাদি) সে জামাতকে বদনাম করে। যে ব্যক্তি (হকুকুল ইবাদ) বান্দাদের অধিকারগুলো আদায় করে না সে জামাতকে বদনাম করে। যেমন জান্নাতের অনেকগুলো পথ আছে, পুণ্যকর্ম করে সে সব পথে যেতে হয়- অনুরূপভাবে জাহান্নামেরও অনেক পথ আছে। এমন যেন না হয় যে, আনুগত্য না করার মাধ্যমে কোন কোন পথ খোলা রাখ। সুতরাং পুরোপুরি বিশ্বস্ততার সাথে আনুগত্য করে যাও। এ জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া চাও। আল্লাহ্‌র ফযল হলে তবে মানুষ এসব কথা থেকে বাঁচতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

আনুগত্য যদি পুরো মাত্রায় হয় তবে হেদায়াত ও পুরোপুরি পাওয়া যায়। আমাদের জামাতের মানুষের জন্য হেদায়াত পরিপূর্ণ করা হয়েছে। আমাদের জন্য কি সঠিক ও কি বেঠিক তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক আহমদী আনুগত্যের উত্তম উদাহরণ সৃষ্টি করে জামাতের বরকতসমূহ লাভ করতে পারে। আমি যেমন একটু আগেই বলেছি, এ জন্য বড় বড় কুরবানি করতে হয় এবং বড় বড় ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। ব্যক্তির ঈমান কত উঁচু তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তার উপর কোন পরীক্ষা এসে পড়ে এবং সে তখন ধৈর্যের সাথে কুরবানি করে ঐ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজকে পার করে নেয়। তার আমিত্ববোধ তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। তার সন্তানরা তার আনুগত্যের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে নিস্তেজ করতে পারে না। যেদিন এমন উচ্চতা লাভ করবে সেদিন তোমাদের ব্যক্তিগত ঈমানও শক্তিশালী হবে, জামাতের দৃষ্টিকোণ থেকেও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ্। অনেকে নিজেদের ঝগড়া বিবাদে আমাদের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেয় না অথবা সে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে তর্ক করে এবং আস্তে আস্তে জামাত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং নিজের ক্ষতি করতে থাকে।

আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন,

অনুবাদ ঃ "এবং তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের এবং পরস্পর কলহ কর না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাবে শক্তি বিলুপ্ত হবে। এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন" (সূরা আনফাল ঃ ৪৭)।

এখানে আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, 'স্মরণ রাখ, তোমাদের একতা, তোমাদের এক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকা নির্ভর করে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের সাথে। অতএব, তোমরা এর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। পরস্পর একে অপরের সাথে ঝগড়া বিবাদ করো না। আল্লাহ্‌র অনেক নির্দেশসমূহের মধ্যে এটি একটি নির্দেশ যে, মুসলমান একে অপরের সাথে যেন ঝগড়া বিবাদ না করে। কিন্তু বর্তমান যুগে দেখুন কি হচ্ছে, এক ফেরকা অন্য ফেরকার (সার্টের) গলায় ধরে কিভাবে টানাটানি করছে। এক সংগঠন অপর সংগঠনের বিরুদ্ধে গাল মন্দ করছে। এটাই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, এমন হবে এবং এভাবে তোমরা সাহস হারাবে, তোমাদেরকে কেউ আর ভয় করবে না। আজকাল এ রকম হয়ে গেছে। মুসলমানদের এত বড় বিপুল জনসংখ্যা, পেট্রোলের অগাধ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কেউ ভয় করে না। অন্যরা এদেরকে তাদের নিজের ইচ্ছামত চালাচ্ছে। যদি মুসলমানদের ধৈর্য ধারণ করত, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলত, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষকে গ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কে অধৈর্যের পরিচয় না দিত, কুধারণা পোষণ না করত তাহলে এ অবস্থা হতো না। যাহোক, আমরা যারা দাবী করি য, আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি এমন আমাদের উচিত আমাদের পূর্ববর্তীদের (মুসলমানদের) নুমনাকে সামনে রাখা (অর্থাৎ তারা যে ভুল করেছে তা না করা) এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ) এর আদেশ নিষেধ মেনে চলা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন সে শিক্ষাকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা পুরোপুরি তার আনুগত্য করা। পরস্পর একে অপরকে ভালবাসা, ঝগড়া-ঝাটি না করা- বিষয় আশয় যাই হোক ধৈর্যের সাথে বিবেচনা করা। তাহলে ইনশাআল্লাহ্ জামাতের ভাবগাম্ভীর্য কায়েম থাকবে, যা আল্লাহ্ আমাদেরকে দিয়েছেন, চিরদিন কায়েম থাকবে। নতুবা আমাদের পৃথক পৃথকভাবে কারো কোন মর্যাদা থাকবে না।

আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে বলে দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন নুসিরতু বররোবে যে আমাকে রোব (ভাব গাম্ভীর্য) বা ভয় দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। [অর্থাৎ মানুষ এমনিতেই ভয় করবে।] অর্থাৎ হযরত (আঃ) এর জন্য রোব আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টি করবেন। তিনি নিজেই সাহায্য করবেন। সুতরাং যারা হযরত (আঃ) এর জামাতে শামিল থাকবে, তার আনুগত্য করবে, নেযামের আনুগত্য করবে, হযরত সাহেবের সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের রোব কায়েম করবেন। অতএব, আপনারা চিরদিন স্মরণ রাখবেন যে, আনুগত্যের মধ্যেই সমস্ত কল্যাণ, আনুগত্যের মধ্যে সকল কামিয়াবী বা সাফল্য।

হযরত ওবাদা বিন সামেত (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, "আমরা আঁ-হযরত (সাঃ) এর বয়আত এ কথার উপর বলেছিলাম, 'আমরা শুনব, আমরা মানব, 'কষ্ট হোক বা সুখ হোক,

সচ্ছলতা হোক বা দুরবস্থা হোক, এবং আমরা কর্মকর্তাদের সাথে (উলিল আমর) ঝগড়া বিবাদ করব না। আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্যের উপর কায়েম থাকব, কোন দুর্নাম শুনে বিচলিত হব না।" (সহী মুসলিম, কিতাবুল এমারাত)।

প্রথম কথা এই যে, বয়আত যখন করেছি তখন সমস্ত আদেশ নিষেধ মেনে চলব। এমন না যে, আমাদের পছন্দমত সিদ্ধান্ত হলে মানব, তখন আমাদের চেয়ে বেশি মান্যকারী আর কেউ থাকবে না। কিন্তু সিদ্ধান্ত যদি আমাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়, যার ফলে আমাদের উপর কিছু কষ্ট বা ব্যথা আসে তখন আর আমরা আনুগত্য করলাম না। জামাতী নেযামের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে দিলাম না; বরং অবস্থা যা-ই হোক না কেন- যেমন বলা হয়েছে সহজ হোক বা কঠিন হোক; যে কোন অবস্থাতে আমরা নেযামের পুরোপুরি আনুগত্য করব নেযামের সাথে নিজকে সম্পৃক্ত রাখব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে বয়আত নিয়েছেন সেখানেও আছে "আপনার সকল কল্যাণময় নির্দেশ পালনে সচেষ্ট থাকব" এখন পর্যন্ত বয়আতের মধ্যে একথাটি আছে। সুতরাং একথা না যে, আঁ-হযরত (সঃ) এর সময় বয়আতের মধ্যে কথাটি ছিল, এখন নাই। অথবা আজ আমরা এটি অমান্য করলে গুনাহ্ হবে না। এমন কথা মাথায় থাকলে তা বের করে ফেলুন। কারণ আঁ-হযরত (সঃ) এর ভবিতব্য অনুসারে এ জামাত কায়েম হয়েছে, এ জন্য এ জামাত তাঁরই (সঃ) জামাত। তাছাড়া আঁ-হযরত (সঃ) এর পৃথক হাদিস তো আছেই যে, যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে, যে আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। যে আমার আমীরের অবাধ্য হয় সে আমার অবাধ্য হয়; যে আমার অবাধ্য হয় সে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়" (সহী মুসলিম; কিতাবুল এমারত)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত যুগ ইমাম, সুতরাং খুব বুঝে নেয়া উচিত যে, এ জামাত আঁ-হযরত (সঃ) এর আদর্শে গড়া জামাত। অতএব, আল্লাহ্র কাছে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত যেন আমাদের দ্বারা কোন বে-আদবী হয়ে না যায়। (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ)।

হুযূর (আঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, সে হেদায়াত পেয়েছে, যে পুরোপুরি ঈমান এনেছে এবং হেদায়াত পেয়েছে, যার মধ্যে আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় ভরা আছে, এক বিন্দুও যার মধ্যে আনুগত্যের অভাব নেই। সামান্য পরিমাণও সে আনুগত্যের বাইরে না। বলেছেন, আল্লাহ্র বিশেষ ফযলে এমন অবস্থা লাভ করা যেতে পারে। অতএব, এর জন্য আল্লাহ্র সাহায্য চাইতে থাকা প্রয়োজন। তিনি যেন আমাদেরকে এমন হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করেন যার ফলে আমাদের আনুগত্য প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। আমরা বড় ভাগ্যবান যে, আমরা যুগ ইমামের জামাতে শামীল হতে পেরেছি, যিনি অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করে আমাদেরকে এ সমস্ত বিষয়ে অবগত করেছেন যেন আমরা আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ) এর আনুগত্যকারী বলে গণ্য হতে পারি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আমাদের শাসনকর্তা যদি যালেম অত্যাচারীও হয় তবুও তোমরা তার বিরুদ্ধে কথা বল না এবং নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা কর এবং দোয়া করতে থাক, খোদাতাআলা তাকে বদলি করে দিবেন অথবা তাকে নেক বা পুণ্যবান বানিয়ে দিবেন। মানুষের উপর যে কষ্টের যুগ আসে তা তার কুকর্মের জন্য আসে। নতুবা মোমেনদের সাথে তো সর্বদা খোদাতাআলার সমর্থন থাকে। মো'মেনদের জন্য আল্লাহ্ নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমার উপদেশ এই যে, সকল উপায়ে তোমরা উত্তম নমুনা দেখাও, খোদার অধিকারও (প্রাপ্য) খর্ব কর না বান্দার অধিকারও নষ্ট করো না" [তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ২য় খন্ড; ২৪৬ পৃষ্ঠা, সূরা নিসা ঃ ৬০)।

হযরত (আঃ) বলেছেন যে, শাসক হোক বা আমীর হোক অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা (ওয়াহ্দাদার) হোক, যে কোন কর্মকর্তাই হোক না কেন; তোমার যদি নিজেরা স্বচ্ছ পরিষ্কার হও, নিজেদের সংশোধন করতে সচেষ্ট হও, দোয়ারত থাক, আল্লাহ্ সেই কর্মকর্তাকে বা শাসককে পরিবর্তন করে দিবেন বা সরিয়ে দিবেন অথবা তাকে পুণ্যবান বানিয়ে দিবেন- তার মধ্যে ভাল পরিবর্তন সাধিত হবে, তার স্বভাব বদলে যাবে। বলেছেন, অনেক সময় মানুষের নিজের কর্মফলের কারণেই পরীক্ষায় পড়ে যায়, নিজের মন্দ কাজের ফলে এমন হয়। তার এমন কোন অপকর্ম থাকে যার ফলে তাকে ইহজীবনেই পরীক্ষায় ফেলে দেন। এজন্য সবসময় এস্তেগফার করতে থাকা উচিত; পুণ্যকর্ম করে যাওয়া উচিত, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ মেনে চলা উচিত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্তাআলা আমার উম্মতকে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী করবেন না। আল্লাহ্র সাহায্য জামাতের জন্য অবধারিত ও সুনিশ্চিত। কিন্তু যে নিজকে জামাত থেকে পৃথক করে নেয় ["মান সায্যা শুয্যা ফীন নারে"] সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।" (তিরমিযী; কিতাবুল কিতাব, বাব ফী লুযুমিল জামাআত)।

আঁ-হযরত (সঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মুসলমানদের জন্য এর হাজার বছরের একটি অন্ধকার যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে যে যুগে মুসলমানদের অধিকাংশ মানুষ ধর্মকে ভুলে গেছে। তারপর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে পাঠিয়েছেন। তিনি এসে একটি জামাত কায়েম করেছেন। যে জামাতের উপর পৃথিবীর সকল মানুষের হেদায়াতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মতের ঐ সকল মানুষ যারা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর জামাতে শামিল হয়েছে তারা নিশ্চয় পৃথিবীতে যালালাত যা গুমরাহী (বিপথগামিতা) প্রচার করতে একত্রিত হয়নি। বরং নিশ্চয় তারা পৃথিবীর মানুষকে এক খোদার সন্ধান দিতে একত্রিত হয়েছে। সুতরাং এ জামাতের মধ্যে কেবল তারাই থাকতে পারবে যারা পুরোপুরিভাবে আনুগত্যের উত্তম নমুনা দেখাবে। এমন মানুষেরা যেখানে একত্রিত হয় সেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ্র সমর্থন অবশ্যই থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি বিশ্বস্ততার এবং আনুগত্যের উন্নত ও উঁচু উদাহরণ সৃষ্টি করে না সে নিজের ক্ষতি করে।

অতএব, সব সময় মনে রাখা উচিত যে, বরকত চিরদিন জামাতের আনুগত্যের মধ্যে এবং নিজকে এর সাথে সংযুক্ত রাখার মধ্যে নিহিত আছে ও থাকবে। কখনও যদি কোন ভুল সিদ্ধান্তও কারো বিরুদ্ধে হয়ে যায় তবুও যেমন একটু আগেও বলেছি, তার উচিত ধৈর্য

রাখা। কখনই অধৈর্য হওয়া উচিত না। প্রত্যেকের নিজের বুদ্ধিবিবেচনা থাকে। দারুল কাযা (বিচার বিভাগ) যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তা হয়ত একপক্ষের কাছে সঠিক মনে হচ্ছে না কিন্তু সে সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া চাই। দোয়া করবেন যে, আমাদের কাযীগণকে (বিচারকগণ) আল্লাহ্‌তাআলা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন। কাযীগণেরও ভুল হতে পারে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতে আনুগত্য করা ফরয। অনেক এমন উগ্র মেজাজের মানুষও থাকে যে, কোন সিদ্ধান্তের কারণে তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামাতের সাথে সম্পর্কই ছিন্ন করে ফেলে। এটি তাদের দুর্ভাগ্য, পূর্বে উল্লেখ করেছি এরা নিজেদেরকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ইহজাগতিক সামান্য কয়েকটি টাকার বদলে ঈমানকে নষ্ট করছে। তারা তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামাতে শামীল হয়েছে; মজলিসে আমেলার মেম্বারদের জামাতে শামীল হয়নি। তাহলে কয়েকজন কর্মকর্তার ভুলের কারণে নিজেদের ঈমান নষ্ট করতে যাবে কেন? কর্মকর্তাদেরও সাবধান হওয়া চাই। কোন দুর্বল ঈমানের মানুষের জন্য তারা যেন হোঁচট খাওয়ার কারণ না হয়।

হাদিসে আছে, (ওয়াহ্‌দাদার) কর্মকর্তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা কি সঠিকভাবে সততার সাথে কর্তব্য পালন করছে – তারা কি ন্যায় বিচার করছে? হাদিসে আছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা এমন লোকদের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন যারা সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে না। এটা কর্মকর্তাদের জন্য বড় সতর্কবাণী। এবার বিবেচনা করে দেখুন, আল্লাহ্‌তাআলা যখন নিজেই হিসাব নিচ্ছেন তখন যারা বিচার বিভাগের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে তাদের মন খারাপ করার তো কোন কারণ নাই। আপনারা পুণ্যের উপর নিজকে কায়েম করুন, দেখবেন আল্লাহ্‌তাআলা আপনার জাগতিক ক্ষয় ক্ষতিও পূরণ করে দিবেন।

হাদিসে আছে, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, ছাগলের শত্রু যেমন নেকড়ে বাঘ; যে ছাগল নিজ রাখালের পাল থেকে (Flock) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাকে অতি সহজে শিকার করে ফেলে। অনুরূপভাবে মানুষের শত্রু শয়তান, নেকড়ে বাঘের মতই; যদি মানুষ জামাতের মধ্যে নিজকে অন্তর্ভুক্ত করে না রাখে তাহলে পাল থেকে ছিটকে পড়া ছাগলের মতই অতি সহজে সে শত্রুর আক্রমণের শিকার হয়। তাই তো বলা হয়েছে, "তোমরা সীমানার উপর দিয়ে চল না বরং তোমরা জামাত এবং সকল মুসলমানদের সাথে থাক।" এর অর্থ এই যে, শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় এই যে, নিজকে জামাতের অন্তর্ভুক্ত রাখ, পৃথক থেকো না। আজকের যুগে তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামাতই একমাত্র ঐশী জামাত। এ জামাত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দিচ্ছে। অন্য কোন জামাত যদিওবা আল্লাহ্‌র জামাত বলে পরিচয় দেয় কিন্তু তাদের আরো অন্য রকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ রয়েছে। সুতরাং আপনারা যারা আমাদের এ নিরাপদ দুর্গের মধ্যে এসে গিয়েছেন তারা সুন্দরভাবে দৃঢ়ভাবে এর মধ্যে অবস্থান করুন। আনুগত্য করতে থাকুন। নতুবা যেমন বলা হয়েছে যে, নেকড়ে বাঘ এক এক করে সবাইকে খেয়ে ফেলবে এবং এখনও খাচ্ছে। আমাদের সামনে রোজই এমন দৃশ্য আসে। এখানে আরো একটি সমস্যারও সমাধান হয়েছে। আর তা এই যে, আমাদের জামাতের লোকেরাই আম্মাতুল মুসলেমীন বা সাধারণ মুসলমান জনতা। অর্থাৎ সংখ্যায় যারা অনেক বেশি তারা আম্মাতুল মুসলেমীন না। সুতরাং আপনারাই ভাগ্যবান যারা এ জামাতে শামীল হয়েছেন। আপনারাই আম্মাতুল মুসলেমীন বলে পরিচিতি পাওয়ার যোগ্য। অতএব, আপনারা যদি নিজেকে রক্ষা করতে চান-যেমন পূর্বে বলেছি, পুরো মাত্রায় ধৈর্য রেখে বিশ্বস্ততার সাথে আনুগত্য অবলম্বন করুন।

একটি হাদিসে আছে, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেহেস্তের মাঝখানে নিজের ঘর বানাতে চায়, তার উচিত জামাতের সাথে নিজকে সম্পৃক্ত রাখা। কারণ শয়তান প্রত্যেকের সাথে লেগে থাকে যতক্ষণ সে একা থাকে। যখন তারা দু'জন একত্রিত হয় তখন শয়তান তাদের থেকে দূরে সরে যায়। অর্থাৎ শয়তান তাকে ছেড়ে চলে যায়। তার উদ্দেশ্য মানুষের মনের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা। অতএব, জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকার মধ্যেই বরকত নিহিত এবং জামাতী নেযামের আনুগত্য করার মধ্যেই বরকত রাখা হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেককে আনুগত্যের মান উন্নত রাখার শক্তি দান করুন।

অতএব,
সব সময় মনে রাখা উচিত যে, বরকত চিরদিন জামাতের আনুগত্যের মধ্যে এবং নিজকে এর সাথে সংযুক্ত রাখার মধ্যে নিহিত আছে ও থাকবে। কখনও যদি কোন ভুল সিদ্ধান্তও কারো বিরুদ্ধে হয়ে যায় তবুও যেমন একটু আগেও বলেছি, তার উচিত ধৈর্য রাখা। কখনই অধৈর্য হওয়া উচিত না।

এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, শয়তান সারাক্ষণ এ চিন্তায় ও চেষ্টায়রত থাকে যে, কিভাবে মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে; একে অপরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করবে– ক্ষোভ সৃষ্টি করবে। এ জন্যই দেখা যায় যে, অনেক সময় অনেক ভাল মানুষ বিবেকবান মানুষও ভাল পথে চলতে থাকে। সে বুঝতেই পারে না যে, সে শয়তানের পেছনে চলছে।

এবার জার্মানীর ১০০ মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে কিছু বলতে হবে। কয়েকজনের অভিযোগ আছে যে, এ বেশ কতকগুলো অনেক বড় বড় দালান কেনা হয়েছে- এগুলো না কিনলে এর বদলে অনেকগুলো ছোট ছোট মসজিদ বানানো যেত। আবার একথাও হয়েছে যে, এগুলো ঐ ১০০ মসজিদের স্কীমের মধ্যে পড়ে না। কয়েকজনে পত্র লিখেছেন, বার বার লিখেছেন যে, "আপনাকে এখানকার অবস্থা লিখে জানাচ্ছি যে এখানে কি হচ্ছে।" যারা আমাকে লিখেছেন তাদেরকে আমি জানাতে চাই যে, গত বছর অথবা তারও আগে আমি এ সমস্ত বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছি। আমার জানা আছে যে, কোন কোন স্থানে দালাল / বিল্ডিং কেনা হয়েছে এবং এগুলোকে ১০০ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি হবে না। আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত আছি। আপনারা যারা একবার লিখেছেন তারা ঠিক করেছেন যে, যা ভাল মনে করেছেন আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আপনার কর্তব্য আপনি পালন করেছেন। বার বার লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা তো তাহলে জেদ ধরা হয়ে যায়। আমাকে লিখেছেন, আমি সাধারণভাবে একটা উত্তর দিয়েছিলাম যে, আপনার পত্র পেয়েছি

জাযাকাল্লাহ্। এতটুকুই যথেষ্ট। প্রত্যেকের চিঠিতে বিস্তারিত সব কথা লেখা তো আবশ্যক নয়। বার বার এক কথা জোরালো ভাষায় লেখা উচিত না। অনেক সময় কোন কর্মকর্তাও (ওয়াহ্দাদার) লিখেছেন, এটা ভুল।

আমি যখন বড় বড় কেনা দালানগুলোকেও ১০০ মসজিদের স্কিমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি–এরপর আপনারা কি বলতে চান? আমি মনে করি যে, সেগুলো এই টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে এবং ঐ স্কিমের অন্তর্ভুক্ত। যারা এর বিপক্ষে আমাকে লিখেছেন তারা অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্পর্কে বড় কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। মসজিদ ক্রয় কমিটি সম্পর্কে বড় কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ভুল পদ্ধতি। এটিও এক প্রকার আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার সমতুল্য। অধৈর্যের পরিচায়ক। সুতরাং এ থেকে বিরত থাকুন। আপনাদের জন্য ১০০ মসজিদের পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে, এর উপর কাজ করে যাবেন, এটাই আপনাদের কাজ। আপনারা কাজ করুন। দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য চান। ইনশাআল্লাহ্ তিনি সাহায্য করবেন। এখন তো এ কাজে অগ্রগতি হয়েছে। এ কাজও ইনশাআল্লাহ্ সুসম্পন্ন হবে। নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এটা দেখে অন্যরাও মনোযোগী হয়েছেন। অনেকের মনেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের অঞ্চলেও মসজিদ হওয়া চাই। চেষ্টাও চলছে।

আল্লাহ্তাআলা আরো বরকত দান করুন।

তারপর যে কথা বলতে চাই তা এই যে, কোন পুণ্য বা নেকীর কাজ বা খেদমতে খালকের কাজ যদি জামাতী নেযামের বিরুদ্ধে পাল্লা দিয়ে করা হয় তাহলে সে কাজে জামাতের নেযামের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য করা হয় না। যুগ খলীফার পক্ষ থেকে এমন কাজে সাহায্যের আশা করা উচিত না। জামাতী নেযাম থেকে সরে গিয়ে যে কাজ করা হয় সে কাজে খলীফা সন্তোষ প্রকাশ করবেন–এটাও আশা করা উচিত না। জামাতী নেযামের হেফাযত (নিরাপত্তা) করা যুগ খলীফার সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কারণ দু'টো নেযামকে বরাবর সমান্তরালে চালিয়ে সাফল্য আশা করা যায় না। যেমন, এ দেশে কতকগুলো শর্ত পূরণ না করলে হোমিওপ্যাথি প্রাকটিস করার অনুমতি নাই। এ কারণে জামাত জামাতীভাবে এ কাজে হাত দিতে পারে না। যদিও কেউ নিজ থেকে এ কাজ করছে বা করতে চায়, করুন, খেদমতের নিয়তে করছেন, করুন। কিন্তু জামাত এতে অংশ গ্রহণ করবে না। কোন ব্যক্তির পত্রের জবাবে যদি আমি প্রশংসা করে থাকি তাহলে তার তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর অর্থ এটা হয় না যে, সেটা জামাতী নির্দেশ হিসাবে গণ্য হবে এবং এখন সে ব্যক্তি আমীরকেও অবজ্ঞা করবে বা তার সাথে পাল্লা দিতে শুরু করবে, লড়তে শুরু করবে। এখানে আমি নাম উল্লেখ করছি না, যে এমন করেছে আশা করি সে বুঝবে এবং নিজের সংশোধন করবে।

তারপর হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর কথা। হিউম্যানিটি ফার্স্ট একটি যথারীতি রেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠান। এর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা অফিস লন্ডনে অবস্থিত। লন্ডন থেকেই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আফ্রিকা এর প্রধান কর্মক্ষেত্র। জার্মানী ছাড়া অন্যান্য দেশেও এর কাজ চলছে। এখানে জার্মানীতে এটি সক্রিয় না। এখানে এ জন্য সক্রিয় না যে, এখানে যারা কর্তব্যরত ছিলেন তারা কোন কোন ব্যাপারে নিজেদের মর্জিমত স্বাধীনভাবে কাজ করতে চেয়েছেন। এখন থেকে আমি এখানকার এ কাজের জন্য আমীর সাহেব জার্মানীকে "নিগরানে আলা" সবার উপরে নেগরান (তত্ত্বাবধায়ক) বানাচ্ছি। তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে পুরো বিষয়টিকে Re-Organize করবেন। একজন চেয়ারম্যান করে আরো দু'জন মেম্বার নিয়ে তিনজনের একটি কমিটি বানাবেন। তারপর যেভাবে অন্যান্য দেশে তারা মানবতার সেবা করছেন কেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে এরাও করবেন। হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টেও এ কথা ছিল যে, এখানকার কমিটি কেন্দ্রের সাথে সহযোগিতা করছিল না। বার বার দৃষ্টি আকর্ষণের পর এখন কিছুটা ভালোর দিকে আসছে। কিন্তু তবুও পুরোপুরি নয়। এটাও আনুগত্যের অভাব। যেমন আমি আগেও বলেছি যুগ খলীফার সাথে যদি সরাসরি যোগাযোগ থাকে তাহলে এরা মনে করে যে, নেযামের কর্মকর্তাদের সাথে যা ইচ্ছা তা করা যায়। এটি ঠিক নয়। এমন ধারণাকে মাথা থেকে বের করে ফেলুন। যদি কোন ব্যবস্থাপনাকে চালাতে গিয়ে কোন সমস্যা হয় তাহলে যুগ খলীফাকে লিখে জানাতে পারেন। কিন্তু সে অঞ্চলের বা দেশের আমীরকে ঐ পত্রের অনুলিপি পাঠাতে হবে। কোন অবস্থাতেই সরাসরি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুমতি নাই। আল্লাহ্তাআলা সকলকে পুরোপুরি অনুগত হয়ে চলার এবং আনুগত্যের মান উন্নত করার শক্তি দান করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ

"আল্লাহ্ ও এ রসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর। আনুগত্য এমন একটি জিনিস যে, আন্তরিকতার সাথে যদি এটিকে অবলম্বন করা হয়, তাহলে অন্তরে এক নূর এবং রূহ এর মধ্যে একটি প্রশান্তি এবং আলো আসে। মুজাহেদাতের [আত্মশুদ্ধির জন্য বড় বড় সাধনা] অতটা প্রয়োজন নাই যতটা আনুগত্যের প্রয়োজন আছে। তবে হ্যাঁ, শর্ত এই যে, সত্যিকারের আনুগত্য চাই বরং এটি একটি কঠিন বিষয়। আনুগত্যের মধ্যে নিজের ইচ্ছাও আকাঙ্ক্ষাকে যবেহ করতে হয়। এ ছাড়া আনুগত্য হয় না, এ ছাড়া আনুগত্য হতেই পারে না। মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা এমন এক জিনিস যা বড় বড় তৌহিদপন্থীদের অন্তরেও প্রতিমা হয়ে অবস্থান করে। সাহাবায়ে কেরামের [রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম] উপর কত বড় আল্লাহ্র ফযল- যে, তাঁরা আঁ -হযরত (সঃ) আনুগত্য করতে গিয়ে নিজেদেরকে শেষ করে দিয়েছিলেন। এটাই সত্য কথা যে, কোন কওম (জাতি) কওম বলে আখ্যায়িত হতে পারে না এবং তাদের মধ্যে একতার রূহ্ (শক্তি) ফুৎকার করা যেতে পারে না যতক্ষণ তারা আনুগত্যের বিধানকে অবলম্বন না করে। আর যদি মত বিরোধ এবং বিচ্ছিন্নতা থাকে তাহলে ধরে নাও যে, এখানে পশ্চাৎপদ ও অধঃপতনের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। মুসলমানদের দুর্বলতা এবং অধঃপতনের অন্যান্য বহু কারণসমূহের মধ্যে তাদের পরস্পর মতবিরোধ এবং অভ্যন্তরীণ ঝগড়া বিবাদও বড় কারণ।" অর্থাৎ এ সমস্ত স্বল্পতা ও অধঃপতন মুসলমানদের মধ্যে ধ্বংস নেমে আসার মূল উপাদান। এ জন্যই তাদের মধ্যে মত বিরোধ ও ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। "অতএব, মত পার্থক্য পরিত্যাগ করুন এবং একজনের আনুগত্য অবলম্বন করুন, আল্লাহ্তাআলা যার আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন তার (আনুগত্য করুন)। তারপর দেখবেন, যে কোন কাজ তারা করতে চাবেন সে কাজ হয়ে থাকে। জামাতের উপরে সব

সময় আল্লাহ্‌র হাত থাকে। এর মধ্যে এটাই তো রহস্য। এটাই তো হেতু / ভেদ।

আল্লাহ্‌তাআলা তৌহিদকে পছন্দ করেন [অতএব মানব জাতির একতা আবশ্যক] কিন্তু আনুগত্য ব্যতীত একতা হতে পারে না। হযরত নবী (সঃ) এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম বড় বড় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন (সিদ্ধান্ত দেবার যোগ্য ছিলেন)। খোদাতাআলা তাদের এমন করে বানিয়েছিলেন, তারা রাজনীতির কথা বুঝাতেন। পরবর্তীতে দেখুন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এবং পরে অন্যরা যখন খলীফা হলেন- এবং তারা রাজত্ব পেলেন- কত উত্তমভাবে রাজত্ব শাসনের বিরাট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং চালালেন। এর থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু আঁ-হযরত (সঃ) এর সামনে তাঁরা কেমন আচরণ করেছিলেন? আঁ-হযরত (সঃ) যখন যা বলেছেন তৎক্ষণাৎ তারা নিজেদের সমস্ত অভিমত বা বুদ্ধিমত্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং আঁ-হযরত (সঃ) যা বলেছেন তা কার্যকর (আমল) করা জরুরী মনে করেছেন।"

সাহাবায়ে কেরাম যদি পুরোপুরি আনুগত্য এবং নিজের সবকিছু আল্লাহ্‌ ও রসূল (সঃ)-এর হাতে সোপর্দ করার স্বভাব না রাখতেন তাহলে তাদের মধ্যে বিবাদ-বিভেদ সৃষ্টি হত এবং তারা কখনই এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতেন না। আমার মতে শিয়া সুন্নী ঝগড়া মেটাতে এতটুকু দলিল যথেষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কোন প্রকার মতভেদ বা বিভাজন ছিল না। এক অপরের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ বা শত্রুতা ছিল না। তাদের অগ্রগতি ও উন্নতি প্রমাণ করে যে, তারা এক হাতে একত্রিত ছিলেন। কোন প্রকার বিবাদ, বিচ্ছিন্নতা বা শত্রুতা ছিল না। নির্বোধ বিরোধীরা বলেছে ইসলাম তরবারির বলে প্রচার লাভ করেছে। কিন্তু আমি বলছি এ কথা সঠিক নয়। আসল কথা এই যে, (তাদের) হৃদয়ের নালীগুলো আনুগত্যের পানিতে ভরে প্রবাহিত হচ্ছিল। তাদের এ রকম আনুগত্য এবং একতার ফলেই তারা অন্যদের হৃদয় জয় করেছিলেন...। আঁ-হযরত (সঃ) এর পবিত্র মুখমন্ডলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতার নূরের আচ্ছদন ছিল যার মধ্যে জালাল (প্রতাপ ও বিক্রম) ও জামাল (সৌন্দর্য) এর রং শোভা পাচ্ছিল। এতে এমন জোড়ালো আবেদন ও আকর্ষণ শক্তি ছিল যে, মানুষের হৃদয় অবলীলাক্রমে তাঁর (সঃ) প্রতি আকৃষ্ট হতো। আঁ-হযরত (সঃ) এর জামাত আনুগত্যের এমন এক নমুনা দেখিয়েছে, তাদের আনুগত্যের মধ্যে এত দৃঢ়তা ছিল যা অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছে, যে দেখেছে সেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তাদের দিকে চলে এসেছে। তবে সাহাবায়ে কেরামের মত অবস্থা ও একতার প্রয়োজন আজও আছে। কারণ আজ মসীহ্‌ মাওউদ এর হাতে যে জামাত প্রস্তুত হচ্ছে এ জামাতকেও ঐ জামাতের সাথে শামীল করা হয়েছে যে জামাত আঁ-হযরত (সঃ) তৈরী করেছিলেন। জামাতের উন্নতি যেহেতু এমন লোকদের নমুনা দেখে হয়ে থাকে- এজন্য তোমরা যারা মসীহ্‌ মাওউদ এর জামাত বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের জামাতে শামীল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছ, তোমরা সাহাবায়ে কেরামের রং-এ নিজেদেরকে রঙ্গীন কর। আনুগত্য হয় তো এমন হোক, পরস্পরের মধ্যে মায়া-মমতা, ভ্রাতৃত্ব হয়–তো এমন হোক। সারকথা এই যে, প্রত্যেক প্রকারে প্রত্যেক দিক থেকে তোমরা এমনই আকার ও আকৃতি ধারণ কর যেমন সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন।" [তফসীর হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪৬-২৪৮; সূরা নিসা আয়াত ৬০]

তোমরা যারা মসীহ্‌ মাওউদ এর জামাত বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের জামাতে শামীল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছ, তোমরা সাহাবায়ে কেরামের রং-এ নিজেদেরকে রঙ্গীন কর। আনুগত্য হয় তো এমন হোক, পরস্পরের মধ্যে মায়া-মমতা, ভ্রাতৃত্ব হয়–তো এমন হোক। সারকথা এই যে, প্রত্যেক প্রকারে প্রত্যেক দিক থেকে তোমরা এমনই আকার ও আকৃতি ধারণ কর যেমন সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন।"

সুতরাং হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) যেমন বলেছেন পূর্ববর্তীদের সাথে মিলন ঘটাতে হলে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ আনুগত্যের নমুনা দেখাতে হবে। পূর্বেই বলেছি, আনুগত্যের জন্য কুরবানি ও ধৈর্যের বড় প্রয়োজন। অতএব, আপনারা নিজেদের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টি করুন। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে শক্তিদান করুন, আমরা সবাই যেন আনুগত্যের উচ্চতর নমুনা দেখাতে পারি।

জলসায় যারা ডিউটি দিয়েছেন তাদের সকলের শুকরিয়া (ধন্যবাদ) আদায় করতে চাই। প্রথমে ভেবেছিলাম যে, সকলে LIVE শুনতে পারবেন (সরাসরি সম্প্রচার) কিন্তু সেটা হচ্ছে না। সাধারণভাবে সকল কর্মীরা মেহমানদের সাথে আদর-যত্ন ও ভালবাসার নমুনা দেখিয়েছেন। সবাই সবার অনেক খেদমত করেছেন; ব্যবস্থাপনাও ভাল ছিল, যাদের আমি জিজ্ঞাসা করেছি সবাই প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। মহিলা–পুরুষ সকল কর্মীবৃন্দের পক্ষ থেকে উত্তম আনুগত্যের নমুনা পেশ করা হয়েছে। যা নির্দেশ ছিল তা ঠিকমত পালিত হয়েছে। এটা একমাত্র একটি জামাতের মধ্যে অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

গত জলসার শেষ বক্তৃতার শেষে আমি লাজনার জলসাগাহে গিয়ে জলসার উপস্থিতির সংখ্যা বলেছিলাম। আমীর সাহেব আমাকে বললেন আমি মোট উপস্থিতি বলেছিলাম কিন্তু কতগুলো দেশের মানুষ এসেছিলেন তা বলা হয়নি। তাই আবার বলছি, মোট ২৮,০০০ (আটাশ হাজার) মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং জার্মানীসহ ৩০টি দেশের মানুষ এ জলসায় উপস্থিত ছিলেন। (আমার মনে হচ্ছে) ২৯টি দেশের ৩০টি জাতির মানুষ হয়েছিলেন। সম্ভবত জার্মানী বাদে ২৯টি দেশের মানুষ এসেছিলেন। যা হোক ২৯টি দেশের প্রতিনিধিই হয়েছে।

আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। সকলের জন্য জলসার বরকত লাভ হোক। এক সপ্তাহ পরেই ভুলে যাবেন না।

[আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ইং]

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

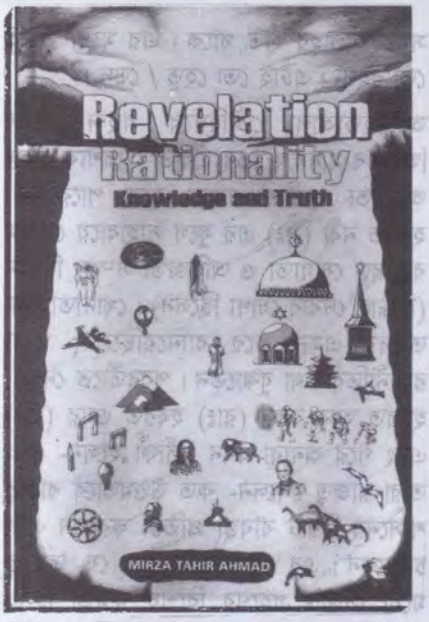

পর্ব ৪ ঃ অধ্যায় ঃ ২

অদৃশ্যে বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একজন মুসলমানকে বুনিয়াদীভাবে যেসব বিষয়ে উপর বিশ্বাস রাখতে হয়, অদৃশ্যের বিষয়াবলী তার মধ্যে অন্যতম। তাই, পবিত্র কুরআনের আয়াতে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ "এই কিতাব অর্থাৎ (অর্থাৎ কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য পথ-প্রদর্শক, যারা অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে" (বাকারা, ৩-৪ আয়াত)। কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, পবিত্র কুরআন মানুষের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনে একদিকে যেমন বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ করেছে, তেমনি কোন অন্ধ বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকার বিষয়টিও পছন্দ করেনি। তাই, কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে (২ঃ৩-৪)। যেখানে অদৃশ্য বা গুপ্ত বিষয়ে বিশ্বাস করার প্রসঙ্গ এসেছে, তা যেমন অন্ধ বিশ্বাস নয়, তেমনি যুক্তি প্রমাণের সমর্থনেই তার প্রকৃত তাৎপর্য যাতে গৃহীত হয় সেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সঙ্গত কারণেই এই বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, এই আয়াতটির সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে মধ্যযুগে ইসলামের বিভিন্ন বিশ্বাসী দল-উপদল পারস্পরিক তর্ক-বিতর্কে অনেক উত্তপ্ত সময় কাটিয়েছে। তাদের মধ্যে যারা অনড় ও আপোষহীন ধারানার পন্ডিত, তারা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে কোন প্রকার যুক্তির আশ্রয় নিতে নারাজ। তাদের মতে কুরআন আল্লাহ্‌র ঐশীবাণী, তাই এর সকল বিষয়কে কোন যুক্তি বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয়া যাবে না। অন্যদিকে, এই মতের যারা বিরোধী, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত যেসব আয়াত আছে, সেগুলোকে তুলে ধরেন, আর অন্ধ বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তিবাদিতাকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে মনে করেন।

এই ধরনের পরস্পর-বিরোধী ধারনার ভিত্তিতে অদৃশ্যের বিশ্বাস বিষয়টি একটি 'উভয় সংকট' অবস্থায় পতিত হয়েছে। এর মধ্যে যদি কোন নমনীয়তা বা দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যার প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা না আনা যায়, তাহলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরো বেড়ে যাবে, আর তা হলে বিশ্বাস এবং যুক্তির মধ্যে সমন্বয়ের সম্ভাবনাও কমে যাবে, যা সত্যিকার জ্ঞান এবং সত্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে হবে এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা। আমরা ইউরোপীয় দর্শন (European Philosophy) অধ্যায়ে এর কোন কোন বিষয়ে আলোকপাত করেছি, আলোচ্য অংশে আমরা বরং অদৃশ্য বা 'Unseen' বিষয়টি একটু স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

তবে শুরুতেই বলে রাখা ভাল যে কোন জিনিস সম্পর্কে জানা বা বুঝার স্বল্পতা কিন্তু একথা প্রকাশ করে না যে, ওইসব জিনিস আসলেই নেই। তারা হয়তো আছে, কিন্তু এখনো আমাদের অজানা (Behind the veil of the unknown) বা অজেয় অবস্থায় বিদ্যমান। একদিন মানুষের অনুসন্ধান বা খোদার ঐশীবাণীর মাধ্যমে, ঐসব অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়তো উন্মোচিত হবে। মোটকথা, সেইসব সব জিনিস আপাতত আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত নয় (He beyond the direct acces of the five senses) কিন্তু সেগুলো চিরন্তন অজেয় বা অগম্য (Permanently inaccessible) বিষয় বলে অভিহিত হতে পারে না। হয়তো একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সেটা প্রকাশিত হবে। সেজন্যই এই জাতীয় বিষয়ের উপর বিশ্বাস আর অন্ধ-বিশ্বাস সমপর্যায়ের নয়। এ বিষয়টিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কুরআনে বর্ণিত অদৃশ্যের বিষয়াবলী প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত (Supported by irrefutable arguments)। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের অসংখ্য অভিজ্ঞতাও কুরআনের এই জাতীয় রূহানী বিধানকে সমর্থন করে।

জাগতিক এমন অনেক সূক্ষ্ম বস্তু আছে, যা প্রত্যেক পর্যবেক্ষণে নয়, বরং অবরোহী যুক্তির (Logical deduction) অণুসিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হয়েছে, অথবা অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরোক্ষভাবে তাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। নিউট্রিনো (Neutrinos) এবং এন্টি নিউট্রিনো বিষয় (anti-neutrinos) জড় এবং অ-জড় বস্তু (Matter and anti-matter) এবং বোসন ও এন্টি বোসন (Bosons and anti-bosons) তত্ত্ব যেরূপ পরোক্ষভাবে অনুধাবন করতে হয়, অদৃশ্যের বিষয়টিও তেমনি। মানুষের মন হচ্ছে জীবনের ভ্রান্ত সত্তা (Ultimate untity of life)। কিন্তু একে দেখা যায় না, যুক্তি দিয়ে বুঝা যায় যে মন আছে। কেউ যেন আবার মনে না করে যে, মানুষের অস্তিত্ব ও মন একই বস্তু। কম্পিউটারে যেরূপ Hardware ও Software আছে, মানুষের মস্তিষ্ক ও মন অনেকটা সেরূপ। মস্তিষ্কে বিভিন্ন তথ্য বা জ্ঞান সংরক্ষিত থাকে, যেরূপ কম্পিউটার Hardware এ বিভিন্ন স্মৃতিকথা জমা থাকে (a matrial hardware, a store house of memory)। মন সেইসব তথ্য বিশ্লেষণ, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও অতীত বর্তমান পর্যালোচনা করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। অনন্তকাল ও চিরায়ত সত্যের ধ্যান-ধারণা একমাত্র মনেই প্রতিফলিত হতে পারে। তাই, কারণ ও প্রতিফলনের (Cause and effect) ও অসংখ্য শৃঙ্খলের আদি-অন্ত পর্যালোচনা শেষে মনের আয়নায় যে চরম সত্য যৌক্তিক উপসংহার (Rational conclusion) হিসাবে স্পষ্ট হয় তাহলো এই যে, সৃষ্টির প্রথম কারণ কোন অচেতন বা মৃত অস্তিত্ব থেকে জন্ম

নেয়নি (The first cause could not be unconseface and dend)।

স্মরণ রাখা দরকার যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা কোন জিনিষ সম্পর্কে অবহিত হই, কিন্তু যে পর্যন্ত না সেগুলো মানসিক স্পন্দন (Pulse) বা স্তরে স্থানান্তরিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো কোন অর্থ বা ধারণার জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়। আর মনের যে দেখা, তা চোখের বাহ্যিক দেখার চেয়ে অনেক বিস্তৃত ও গভীর (There is more to them than meets the eye)। এই মনের পর্দায় তাই যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা প্রতিফলিত হয়, তেমনি ঐশীবাণীর মাধ্যমে অদৃশ্য কোন বিষয়ও প্রকাশিত হতে পারে। এর একটি আরেকটির পরিপূরক, আর এ দুটো বিষয় কখনো আলাদাভাবে, আবার কখনো একসাথেই কার্যকর হতে পারে (Both can work independently, or jointly)। যেহেতু মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, তাই সে নিজ প্রচেষ্টায় তার কাল ও সময়কে কিছুটা অতিক্রম করতে পারলেও মনের দিক বা শক্তির বিবেচনায় মানসিক দুর্বলতা বহন করেই চলে (the faculty of mind has its own limitations too)। কিন্তু খোদার শক্তি অনন্ত ও অসীম যা স্থান ও সময়ের উর্ধ্বে (Transcends time and space) সেজন্য ওইসব জ্ঞান যা, মানুষের সীমিত শক্তি ও সামর্থের বাইরে তা একমাত্র খোদা যাকে চান, তাঁর ঐশীবাণীর সাহায্যে তাঁকে অবহিত করেন। এই দিকে ইঙ্গিত করেই খোদা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন ঃ

"অতএব তিনি (আল্লাহ্) কারো নিকট অদৃশ্যের বিষয়মূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, তবে, এমন ব্যক্তি ছাড়া, যাকে তিনি রসূল হিসাবে মনোনীত করেন।" (জ্বীন ঃ ২৭-২৮ আয়াত)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে কেউ যেন আবার এ ধারণা না করেন যে, খোদার নবী রাসূল ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্য বিষয়ের কিছুই অবহিত হতে পারেন না। সকল যুগের ধার্মিক, বিশ্বাসী ও সাধু ব্যক্তিগণই অদৃশ্যের কোন কোন বিষয় অবহিত হতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ্র নবী রাসূলদের নিকট প্রকাশিত গুপ্ত জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতার সাথে তার তুলনা হয় না। আল্লাহ্র নবী-রাসূলদেরকে এ ধরনের 'গায়েবের' সংবাদের আধিপত্য প্রদান করা হয়, তাছাড়া সেসব বাণীর স্পষ্টতা, নিশ্চয়তা এবং বিশ্বস্ততা সাধারণ বিশ্বাসীদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি থাকে (The Knowledge granted to the non-messengers, even though revelation, can in no way be matched in clarity, certainty and perfection with that bestowed upon the messengers of God)। (চলবে)

সকল যুগের ধার্মিক, বিশ্বাসী ও সাধু ব্যক্তিগণই অদৃশ্যের কোন কোন বিষয় অবহিত হতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ্র নবী রাসূলদের নিকট প্রকাশিত গুপ্ত জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতার সাথে তার তুলনা হয় না। আল্লাহ্র নবী-রাসূলদেরকে এ ধরনের 'গায়েবের' সংবাদের আধিপত্য প্রদান করা হয়, তাছাড়া সেসব বাণীর স্পষ্টতা, নিশ্চয়তা এবং বিশ্বস্ততা সাধারণ বিশ্বাসীদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি থাকে।

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ঃ **অধ্যাপক আমীর হোসেন**

সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার

আল্লাহুম্মা আনতা রব্বি = (হে আল্লাহ্ তুমি আমার প্রভু)।

লা ইলাহা ইল্লা আন্তা = তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

খালক্তানী ওয়া আনা আবদুকা = তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা এবং আমি তোমার বান্দা।

ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা = এবং আমি তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের উপর এবং প্রতিজ্ঞার উপর কায়েম আছি।

মাস্তাতা তু = যতদূর আমার দ্বারা সম্ভব হয়।

আউযুবিকা মিন শাররীম মা সানা'তু = আমি যে সব মন্দ কাজ করেছি তার মন্দ ফলাফল থেকে রক্ষার জন্য তোমার আশ্রয় চাই।

আবূও তাকা যিনি' মাতিকা আলাইয়া = যে সকল নেয়ামত তুমি আমাকে দিয়েছ তা আমি স্বীকার করছি।

ওয়া আবুও বেযাম্বি ফাগ্ফিরলি= এবং আমি আমার গুনাহ্সমূহ স্বীকার করছি, 'অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আন্তা = কেননা, তুমি ব্যতীত কেউ ক্ষমাকারী নেই।

আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া দিকা মাসতাতা'তু আউযুবিকা মিন শাররীম মা সানাতু আবুও লাকা বি নিমাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুও বিযামবি ফাগফিরলি, ফা ইন্নাহু লা ইয়াগ ফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা। (বুখারী)

একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) অনেক বেশী দোয়া করতেন। আমরা একবার হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হুযূর (সঃ) যত দোয়া করেন আমরা ততটা পারি না। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন দোয়া বলব না, যে দোয়া সকল দোয়ার কাজ করবে? হুযূর (সঃ) বললেন, তোমরা বল, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্য়ালুকা মিন খায়নির মা সায়ালাকা মিনহু নাবীয়ুকা মুহাম্মদ (সঃ) ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিন মাস্তা'যা মিনহু নাবীয়ুকা মুহাম্মদ (সঃ) ওয়া আন্তাল মুসতায়ানো ওয়া আলায়কাল বালাগ, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়ীল আযীম"।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট থেকে ঐ সকল কল্যাণ কামনা করছি যা তোমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সঃ) তোমার থেকে কামনা করেছেন। আমি তোমার নিকট ঐ সকল অনিষ্ট ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা ও তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা থেকে প্রিয় নবী (সঃ) তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। একমাত্র তুমিই এমন এক সত্তা যাঁর থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা যায় এবং পৌছে দেওয়া একমাত্র তোমারই কাজ। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কোন ক্ষমতা ও প্রাধান্য নেই।

সংগ্রহ ঃ **মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী**

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(১-৮-২০০০ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকেস সংকলিত। জনাব আব্দুল্লাহ্ সাহেব অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন)

হুযূরের সাথে এই সাক্ষাৎ হুযূরের (আইঃ) ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের পর অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব হুযূরের অনুমতি নিয়ে প্রথমে জনাব জোবায়েরকে একটি নযম পড়তে বলেন। এই নযমে হুযূরের প্রত্যাবর্তনের জন্য আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছিল। হুযূর জোবায়ের সাহেবের মধুর কণ্ঠের প্রশংসা করেন।

১। **প্রথম প্রশ্ন ঃ** হুযূরের ইন্দোনেশিয়া সফর আল্লাহ্র ফযলে খুবই সফল হয়েছে। বাংলাদেশেও হুযূরকে পেতে চায়। আমরা কীভাবে হুযূরকে বাংলাদেশে নিতে পারি? **হুযূর বলেন** একজন নেতৃত্ব স্থানীয় অ-আহমদী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে প্রথমে রাজী করাতে হবে তিনি লন্ডনে হুযূরের সাথে দেখা করে মতবিনিময় করবেন। তিনি যদি হুযূরের সাথে আলাপ করে পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্ট হন তো তিনি হুযূরকে বাংলাদেশ ভ্রমণের দাওয়াত দিতে পারেন যেভাবে ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রফেসর দওয়াম করেছিলেন। হুযূর বলেন, শুধু আহমদীদের চেষ্টায় এ রকম ভ্রমণ ততটা সফল হবে না-অ আহমদীদের সদিচ্ছার ও আগ্রহেরও বিশেষ দরকার আছে।

হুযূর বলেন, তিনি ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণে সব সময় বাংলাদেশের কথা মনে করেছেন। বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অনেক মিল আছে। দুই দেশের সংস্কৃতি এক রকম, খাবার-দাবার এক রকম, গাছপালা তরি-তরকারী ফল যেমন কলা, ঝিংগা সব কিছুই এক রকম। হুযূর বলেন, তিনি ইন্দোনেশিয়ায় যতদিন ছিলেন প্রত্যেকদিনই বাংলাদেশের কথা মনে করতেন।

২। **দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ** হুযূরের ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ বাস্তবে অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু হুযূরের রওয়ানা দেয়ার পূর্বে কতক আহমদী ভাই এর মনে বেশ আশঙ্কা ছিল যে, সেখানকার মোল্লারা হুযূরের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারতো অথবা জামাতের শত্রুরা কোন ষড়যন্ত্র করতে পারতো। আমার প্রশ্ন এটাই সেখানকার মোল্লারা কি হুযূরের ভ্রমণের সময় কোন অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল?

হুযূর বলেন, আল্লাহ্ ঐ রকম সব আশঙ্কা ভিত্তিহীন প্রমাণ করেন। এটা সত্য যে কত আহমদী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুলোক স্বপ্নও দেখেছিল যে, আল্লাহ্ না করুন ইন্দোনেশিয়ায় হুযূরের আক্রমণ হতে পারে। তারা হুযূরকে সবিনয় অনুরোধ করেন, হুযূর যেন ইন্দোনেশিয়া না যান। কিন্তু হুযূর সিদ্ধান্ত নেন, তিনি ইন্দোনেশিয়া যাবেন এবং কোন নেতিবাচক চিন্তা মনে জায়গা দিতে না করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, হুযূরের ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের কিছুদিন পূর্বে সেই দেশের রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদ সাহেব পাকিস্তান ও সউদী আরব ভ্রমণ করেন। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এর সঙ্গেও দেখা করেন। আহমদীরা মনে করেছিলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নিজে অথবা তাঁর ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টকে আহমদীয়া জামাতের খলীফার আসন্ন ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন। এসব ব্যাপার গোপন থাকে না জানা-জানি হয়ে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট নিজেও এই ভ্রমণের কথা বলে থাকতে পারেন। এই সব কারণে আহমদীরা কিছুটা চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। যা-ই হোক বাস্তবে কোনই অসুবিধা হয়নি। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদ নিজে হুযূরকে সাক্ষাত দান করেন। তিনি হুযূরের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি হুযূরকে ইন্দোনেশিয়ার জন্য দোয়ার অনুরোধ করেন এবং হুযূরকে বলেন, আহমদীয়া জামাত যেন ইন্দোনেশিয়াকে সাহায্য করে। রাষ্ট্রপতি সর্বক্ষেত্রে আহমদীদের সাহায্য চান-অর্থনীতি,সংস্কৃতি এবং ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরীণ উপজাতিসমূহের মধ্যে সম্প্রীতি পুণঃস্থাপনের জন্য। প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদ যদি আহমদীয়া জামাতকে অপসন্দ করতেন তো এসব কথা কখনই বলতে না। হুযূর বলেন, তিনি যেসব জায়গায় গিয়েছিলেন এবং যে সকল ব্যক্তির সাথে দেখা করেছিলেন যেমন Vice Governors,Chiefs এবং উলামাদের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্র ফযলে ভাল ফলাফল দেখা দিয়েছিল। আসল ব্যাপার হচ্ছে, সব সময় দোয়া করে কাজে হাত দিতে হবে এবং আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে।

ইন্দোনেশিয়ার এক ক্ষমতাধর ব্যক্তি হচ্ছেন জাতীয় পরিষদের স্পীকার। তাঁকে সে দেশের 'কিং মেকার' বলা হয়। এ ব্যক্তি হুযূরের বক্তৃতা শুনতে একাধিকবার এসেছিলেন। তিনি হুযূরকে জাতীয় পরিষদের স্পীকারের দপ্তরেও আমন্ত্রণ করেছিলেন। বেশ কয়জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং উপরস্থ সরকারী কর্মকর্তা সে সময় উপস্থিত ছিলেন। দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্র ফযলে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদীদের প্রপাগান্ডায় তেমন কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি।

৩। **তৃতীয় প্রশ্ন ঃ** পাবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর ৩নং আয়াতে মহানবী (সঃ) এর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি আয়াত আছে-সূরা আলে ইমরানের ১৬৫ নং আয়াত।

আমরা আহমদীরা মনে করি এ দ্বিতীয় আয়াতটিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর উল্লেখ করা হয়েছে। হুযূরও কি এটাকে সমর্থন করেন?

হুযূর বলেন, অনেক সময় মু'মিনীন শব্দটি ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করা হয়। এমন সব লোকের সম্বন্ধে যারা পরবর্তীকালে মু'মিন শ্রেণীভূক্ত হবে। এজন্য হুযূর বিশ্বাস করেন যে, দু'টি আয়াতই মহানবী (সঃ) এর জন্যই কুরআন শরীফে নাযিল হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মহানবী (সঃ) এর আনুগত্য করেছিলেন বলে আল্লাহ্ তাঁকে মহানবী (সঃ) এর প্রতিনিধির মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং এটা অত্যন্ত বড় মর্যাদা যেটা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সূরা জুমুআতে বলা হয়েছে, মহানবী (সঃ) এর এক প্রতিনিধি পৃথিবীতে আসবেন। তাঁর আগমন মহানবী (সঃ) এর আগমনতুল্য হবে। এজন্য আহমদীদের অতি উৎসাহী হওয়া ঠিক হবে না। মহানবী (সঃ) এর মর্যাদাই বড় কথা। তাঁর পর যাঁর আসার কথা তিনি মহানবীর অধীনস্থ হবেন এবং মহানবী (সঃ) এর প্রতিচ্ছবি আকারে আসবার কথা ছিল। তিনি যে মু'মিনগণের মধ্যে আসবেন এটাও স্বীকার করা যায়, কিন্তু মু'মিনগণ শব্দ এমন সব লোকদেরকেও বুঝায় যারা পরে ঈমান আনবেন। উদাহরণস্বরূপ একটি আয়াত আছে ঃ 'কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালায়কাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসূলিহী'-এখানে 'কুল্লুন' শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে এমন সব লোক যারা এখনও ঈমান আনেননি কিন্তু পরে ঈমান আনবেন। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত হচ্ছে, ঐ আয়াত ৩ঃ১৬৫ এর শেষ অংশটি সম্বন্ধে চিন্তা করুন মু'মিনরা কি পথভ্রষ্ট অবস্থায় পতিত হতে পারেন? স্পষ্টই এখানে এমন সব লোককেই বুঝানো হয়েছে যারা ভবিষ্যতে মু'মিন হবেন।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর যুগের মু'মিনদের কথা বলা হয়নি। এটাই মহানবী (সঃ) এর যুগের কথা বলা হয়েছে।

৪। **চতুর্থ প্রশ্ন ঃ** হুযূর, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের মোল্লাদের সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার মোল্লারাও কি সেই ধরনেরই হয়?

হুযূর বলেন, ইন্দোনেশিয়ার মোল্লারা একেবারে ভিন্ন ধরনের। তারাও শত্রুভাবাপন্ন এবং প্রশ্ন করার সময় খুব কঠোর ভাব প্রদর্শন করে। কিন্তু যখন আমরা তাদেরকে ভালবাসা দিয়ে তাদের মন জয় করার ভঙ্গিতে উত্তর দেই তখন তারা মাথা নেড়ে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করতে শুরু করেন। কিন্তু পাকিস্তানের মোল্লারা একেবারেই অন্য রকম। যখন আপনি একটা যুক্তিসঙ্গত দলিল দিবেন তখন তারা খুব জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে না-না-না বলতে শুরু করবে। তারা সাধ্যমত চেষ্টা করবে আপনার মনোবল যেন ভেঙ্গে যায়। তারা বার বার একই কথা আওড়াতে থাকবে যে, আপনি তাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটাই হচ্ছে পাকিস্তানী মোল্লারা এবং ইন্দোনেশিয়ার মোল্লাদের মধ্যে বড় পার্থক্য। ইন্দোনেশিয়ার মোল্লারা যুক্তি মেনে নিয়ে হ্যাঁ বলতে জানে কিন্তু পাকিস্তানের মোল্লারা কখনও যুক্তি মানবে না, হ্যাঁ-ও বলবে না।

৫। **পঞ্চম প্রশ্ন ঃ** আমরা দেখেছি যে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী আবার দ্রুত উন্নতি করে অত্যন্ত শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছে। হুযূর জার্মান জাতির সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করেন? তাদের শক্তির রহস্যটা কী?

হুযূর বলেন, জার্মান জাতির একটা বড়গুণ হচ্ছে তারা ধাক্কা খেয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে যেতে পারে। তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী। বিজ্ঞানেও তারা অন্য কোন জাতির চেয়ে পিছে পড়ে নেই। এবং কারিগরী দিকে তারা প্রথম সারির জাতি। জার্মানরা লেখাপড়ায় আগ্রহী। তাদের আর একটা বড়গুণ হচ্ছে জাতি হিসাবে আত্মসম্মানবোধ অর্থাৎ, যেকোন রাজনৈতিক দলের সমর্থকও এমন কোন কাজ করবে না যেটা গোটা জার্মান জাতির স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর। এটা এমন একটা গুণ যেটা অন্যান্য অনেক জাতির মধ্যে বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এসব দেশের লোকেরা মুখে বড় বড় কথা বলতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় দেশদ্রোহিতা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়; কিন্তু কোন জার্মান নাগরিক তেমন মন্দ কাজ করতে পারে না। তারা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, বিশ্বস্ত, শিক্ষানুরাগী এবং সৎলোক। এজন্য আমি আশা করি, যেসব জার্মান আহমদী হবেন তারাও খাঁটি আহমদী হবেন।

৬। **৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৯০১ খৃষ্টাব্দ এর পূর্বে দাবী করেননি যে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী। যদি তার আগেও তিনি আল্লাহ্‌র ওহী-ইলহাম পেয়েছিলেন কিন্তু মনে হয় আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে সুস্পষ্ট ১৯০১ সালের পূর্বে জানাননি যে, তাঁর মর্যাদা নবীর সমান। এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী?

হুযূর বলেন, আল্লাহ্‌তাআলা তো বারংবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে বলছিলেন যে, তিনি নবী এবং বারাহীনে আহমদী পুস্তকে ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অনেক ওহী ইলহামের উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ মনে করতেন আল্লাহ্ তাঁকে ভালবাসতেন বলে আদব করে ওসব শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ অনেকদিন পর্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে নিজেকে 'নবী' বলা থেকে বিরত থাকলেন। এক রাতে আল্লাহ্ তাঁকে বার বার ওহী করে বললেন, "তুমি নবী" "তুমি নবী"। এ কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজে লিখেছেন একরাত্রে তিনি যখন বিছানায় নিজের মাথা বালিশে রাখলেন সে রাতে ধারাবাহিকভাবে তার কাছে ওহী আসলো, "তুমি নবী"। এমতাবস্থায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর কাছে ব্যাপারটা একেবারে সন্দেহাতীতভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌তাআলা যে তাকে নবী বলে সম্বোধন করে আসছিলেন এটা শুধু আদর করে বলেন না। বরং আল্লাহ্ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে মহানবী (সঃ)-এর অধীনস্থ উম্মতী নবীর মর্যাদা দান করেছেন।

৭। **সপ্তম প্রশ্ন ঃ** জনাব শরাফত আলী সাহেব জানতে চাইলেন হুযূর যখন ইন্দোনেশিয়া সফরে ছিলেন তখন এমটিএ-তে দেখা গিয়েছিল সেখানে এক লম্বা বড় আকৃতির মৌলভী হুযূরের বক্তব্যের সমর্থন করছিলেন। সেই ভাল মানুষটা কে ছিলো? তিনি কি ইন্দোনেশিয়ার লোক ছিলেন না কি কোন পাকিস্তানী মৌলভী ছিলেন? আমরা তার জন্য দোয়া করছি।

হুযূর উত্তরে বলেন, সেই মৌলভী সাহেবের বাবা অথবা মা অষ্ট্রেলিয়ার নাগরিক ছিলেন এবং তার মা অথবা বাবা আয়ারল্যান্ড এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি আজকাল ইন্দোনেশিয়াতে বসবাস করছেন। তিনি জন্মগতভাবে ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী নন। তিনি ইসলাম ধর্মে শিক্ষা লাভ করেছেন ইন্দোনেশিয়াতে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে। বর্তমানে তিনি ইন্দোনেশিয়ার এক অঞ্চলে কার্যরত আছে এবং তার অধীনে ৬০টি বড় বড় মসজিদ আছে। তিনি পাঁচটি ভাষা জানেন এবং ইন্দোনেশিয়ার ভাষায়ও দক্ষ। ইংরেজী এত ভাল জানেন, আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি প্রথমে তাকে স্থানীয় লোক মনে করেছিলাম। পরে জানতে পারলাম, তিনি জন্মগত ইন্দোনেশিয়ায় নন। আপনারা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখেছেন মৌলভী সাহেব অত্যন্ত সাহসের সাথে আমাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বার বার ইন্দোনেশিয়দের বলছিলেন "আপনারা নিজেকে মুসলমান বলেন। যদি মুসলমান দেখতে চান তো তাঁদেরকে দেখুন। যদি আপনারা ইসলামকে জানতে চান তো তাঁর ভাষণ শুনুন। এঁরাই হচ্ছেন খাঁটি মুসলমান। তাঁর তুলনায় আপনাদের তো মুসলমান বলাই উচিত হবে না। এই মৌলভী সাহেব আশ্চর্য রকম সাহস প্রদর্শন করে আমাদের পক্ষেই আহমদীয়ত ও প্রকৃত ইসলাম প্রচার করেন। আপনি সেই মৌলভী সাহেবের কথাই বলছিলেন।

৮। **অষ্টম প্রশ্ন ঃ** সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেব বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নবী হওয়ার পূর্বে সব সময় আল্লাহ্‌র সন্ধান করতেন। একবার তিনি তারকা দেখে তাকে আল্লাহ্ মনে করলেন, পরে ভুল বুঝতে পারলেন। পরে চাঁদ এবং সূর্যকেও আল্লাহ্ মনে করছিলেন। হুযূর, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ রকম অনুসন্ধান ও চিন্তা ধারার সম্বন্ধে আপনি দয়া করে আলোকপাত করবেন কি?

হুযূর বলেন ঃ এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার। জানি না সাধারণ লোকেরা এটা বুঝতে পারে না কেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তো বহুবার তারকা চন্দ্র এবং সূর্য দেখেছিলেন। তারকা যখন ডুবে যেত তো এটা হযরত ইব্রাহীমের জন্য কোন আশ্চর্য ব্যাপার মোটেই ছিল না। আসল কথা কি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে এই পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ববাদ শিক্ষা দিতে গিয়ে ২৪ ঘন্টাব্যাপী এক সভার আয়োজন করেছিলেন। রাত্রে তারকা উঠল, চন্দ্র দেখা গেল, কিন্তু পরে অস্ত গেল তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা এদের আল্লাহ্ মনে করছিলে, দেখলে তো এরা অস্ত গেল। তারপর সূর্য উদয় হ'ল তখন তিনি তাঁর জাতিকে বুঝালেন, দেখ সূর্য কত বড় কিন্তু এটাও কয়েক ঘন্টা পর অস্ত যাবে এবং তা-ই ঘটলো। তারপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতির সবাইকে অকাট্যভাবে প্রমাণ দিলেন যে, আল্লাহ্‌ই সর্বশক্তিমান।

৯। **নবম প্রশ্ন ঃ** মাওলানা বশীরুর রহমান বললেন, হুযূর এমটিএ আল্লাহ্‌র এক অপূর্ব দান। এই গণ মাধ্যম দ্বারা কীভাবে আরও বেশি উপকৃত হতে পারি এ বিষয়ে হুযূর দয়া করে কিছু নতুন নতুন পদ্ধতি বলবেন কি?

হুযূর বলেন, যারা এমটিএ বিভাগে কাজ করছেন তাদের উচিত নতুন নতুন রাস্তা বের করা যাতে আমরা এই গণমাধ্যম থেকে বেশি বেশি উপকৃত হতে পারি এবং তাদের উচিত এমটিএ এর মানকে

উঁচু থেকে উঁচুতর করা। স্থানীয়ভাবেও চিন্তা করা উচিত কী করলে বেশি লোক এমটিএ দেখতে সক্ষম হবে।

১০। **দশম প্রশ্ন ঃ** জনাব মোহাম্মদ আহমদ তপু বলেন– আজকাল বাংলাদেশে ডেঙ্গু (Dengu) জ্বর হচ্ছে এবং পঞ্চাশ থেকে একশ' লোক এই জ্বরে মারাও গেছে। হুযূর যদি দয়া করে আমাদের এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতেন তো আমাদের বড় উপকার হতো।

হুযূর বলেন, ডেঙ্গু জ্বর শুষ্ক অঞ্চলে হয়। এটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, এখন বাংলাদেশেও এটা হচ্ছে। ডেঙ্গু এক অতি ক্ষুদ্র রোগ জীবাণুর মাধ্যমে হয়। এটা ম্যালেরিয়া থেকে একেবারে আলাদা রোগ। আমারও একবার ডেঙ্গু জ্বর হয়েছিল। এই জ্বরে কোমরে খুব ব্যথা হয়। কুইনীন নামের ঔষধেও কোন উপকার হয় না। সাতদিন পর জ্বর ছেড়ে যায়। আমার উপদেশ, যাদের ডেঙ্গু জ্বর হয় তারা ধৈর্য সহকারে সাতদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে দোয়া করবেন।

১১। **একাদশ প্রশ্ন ঃ** আমাদের সূর্য নভোমন্ডলের অংশ এবং Solar Apex এর দিকে যাচ্ছে এ দুটো কথা কি সমার্থক?

হুযূর বলেন, গোটা বিশ্বই একদিকে ধাবিত হচ্ছে। সূর্য ও বিশ্বের অংশ বিশেষ তাই সূর্যও ঐদিকে ধাবিত হচ্ছে। Solar Apex এবং আরবী শব্দ 'মোস্তাকি' এর অর্থ একই ধরা যেতে পারে। কিন্তু আরও একটা অর্থ হচ্ছে সূর্য চিরস্থায়ী নয় এটাও একদিন লয়প্রাপ্ত হবে। সেদিন সূর্যের আলো থাকবে না। অতএব দু'টি অর্থই সঠিক ধরে নেয়া যায়। হয়তো সূর্যের আলো একশ' কোটি বৎসর পরে নিবে যাবে। এই ব্যাপারটা আল্লাহ্-ই ভাল জানেন কিন্তু একদিন না একদিন এটা ঘটবেই।

হুযূর বলেন, সূর্য যদি একা কোন দিকে ধাবিত হ'ত তো পৃথিবী হতে তাঁর দূরত্ব একই রকম থাকতে পারতো না। পবিত্র কুরআন কী সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে, গোটা বিশ্বও এক সাথে ধাবিত হচ্ছে। এরকম যদি না হ'ত তো বিভিন্ন গ্রহ পরস্পরের থেকে দূরে সড়ে যেতে থাকতো।

হুযূর বলেন, পদার্থবিদরা বলেন যে, আমরা যে বিশ্বের মধ্যে আছি এটা এত বিশাল যে, এর দৈর্ঘ ও প্রস্থ দুই হাজার কোটি আলোক বৎসরের সমান কিন্তু ইদানিং এক তথ্যে জানা গেছে এই বিশাল বিশ্ব-জগতও ধীরগতিতে কোন এক বিন্দুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখনও বিজ্ঞানীরা এ তথ্য আবিষ্কার করতে পারেনি যে, নতুন কোন বিশ্ব জগতের দিকে আমার পরিচিত বিশ্ব ধাবিত হচ্ছে কারণ কোন না কোন ধর্মের আকর্ষণ শক্তি না থাকলে এক বস্তু অন্য এক বস্তুর দিকে ধাবিত হয় না।

১২। **দ্বাদশ প্রশ্ন ঃ** জনাব রেজাউল করীম বলেন, সাধারণ লোকেরা মনে করে যেদিন কিয়ামত হবে এ জগতের প্রত্যেকটি জিনিস লয়প্রাপ্ত হবে। কিন্তু আহমদীদের ধারণা কিয়ামত সম্পর্কে অন্য রকম। হুযূর যদি দয়া করে এ বিষয়ে আলোকপাত করেন তো খুব ভাল হয়।

হুযূর বলেন, যখন কিয়ামত আসবে গোটা বিশ্ব-জগৎ লয়প্রাপ্ত হবে না, শুধু আমাদের পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। হয়তো পৃথিবীও পুরোপুরি ধ্বংস হবে না। এ পৃথিবীর সকল লোকজন ধ্বংস হবে। পবিত্র কুরআনে আছে, এক প্রকার জীবনের পরিবর্তে তার চাইতে উন্নত জীবন পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করবে। যদি পৃথিবী এবং বিশ্ব-জগৎ সবই লয়প্রাপ্ত হয় তো নতুন ধরনের উন্নততর জীবনের উদ্ভব কি করে হবে? পবিত্র কুরআন বলছে, বারংবার এই বিশ্ব-জগত নতুন নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটবে।

১৩। **ত্রয়োদশ প্রশ্ন ঃ** হুযূর আহ্লে কিতাব বলতে কাদেরকে বুঝায়?

হুযূর উত্তর দেন, সাধারণতঃ আমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকেই আহলে কিতাব বলে থাকি। কিন্তু শাব্দিক অর্থ হচ্ছে যে কোন ধর্মের অনুসারী যারা বিশ্বাস করে তার ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ্ প্রদত্ত তাদেরকেও আহলে কিতাব বলা যেতে পারে।

১৪। **চতুর্দশ প্রশ্ন ঃ** আজকাল বিজ্ঞানীরা ভ্রূণের মধ্যে Cloning (ক্লোনিং) নামক পদ্ধতির পরীক্ষা শুরু করেছে। এটাকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করা যায় কি?

হুযূর বলেন, বিজ্ঞানীরা যা চায় তাই করে। কারও অনুমোদনের তোয়াক্কা করে না। এখানকার সরকারও ইসলামের অনুসারী সরকার নয়। তাদের জন্য ইসলাম আদেশ নির্দেশের কোন গুরুত্ব নেই। তারা নিজেদের সর্ববিষয়ে স্বাধীন মনে করে কিছু মানবতাবাদী মনুষ্য ভ্রূণের মধ্যে Cloning নামক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে এবং বলে ভ্রূণের উপর Cloning জাতীয় গবেষণা করে অনেক রোগের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। এভাবে তারা এটা ধারণা সৃষ্টি করে রেখেছে যে, Cloning (এবং Genetic Research) দ্বারা মানব জাতির সার্বিক মঙ্গল হবে। এমতাবস্থায় সরকার চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের চাপে কাবু হয়ে আছে।

১৫। **পঞ্চদশ প্রশ্ন ঃ** পবিত্র কুরআনে আছে- আল্লাহ্ কারও কারও হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দেন। আরও এক জায়গায় আছে ভয় প্রদর্শনের পরও কেউ কেউ ঈমান আনবে না। আরিয়া হিন্দুরা বলে, মুসলমানদের আল্লাহ্ খুবই কঠোর খুব বড় শাস্তি দিয়ে থাকেন। হুযূর এ বিষয়ে আলোকপাত করলে ভাল হয়। হুযূর বলেন, পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের অনুবাদ প্রথম থেকেই ভুলভাবে করা হচ্ছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, দুষ্ট লোকেরা নিজেরাই নিজের চোখ কান মন সব ইন্দ্রিয়গুলো পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে রাখে। তারা বদ্ধপরিকর হয়ে যায় যে, তারা কোন অবস্থাতেই সত্য গ্রহণ করবে না। এটা আল্লাহ্র কাজ নয়। দুষ্ট লোকেরা নেহায়েতই ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। আজকালও এ রকম লোক আছে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দাবী সম্বন্ধে বলে থাকে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ বললেও আমরা তাকে সত্যবাদী বলে মানতে রাজী হব না।

১৬। **ষষ্ঠদশ প্রশ্ন ঃ** পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 'আমাওয়াত' শব্দ এসেছে। এ শব্দের সঠিক অর্থ কী? এ শব্দ দিয়ে মহাশূন্যকেও বুঝানো হয় কি? দয়া করে এই আরবী শব্দের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর বলেন, প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্র কাছে একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সকল নবী একদিন থেকে আল্লাহ্র নিকট সমান অর্থাৎ তাঁরা সবাই আল্লাহ্র ওহী-ইলহাম পেয়ে থাকেন। কিন্তু অন্য দিকে থেকে তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কোন নবী আল্লাহ্র খুব নিকটের এবং অত্যন্ত প্রিয় এবং কোন নবী তুলনামূলকভাবে কম নিকটের। পবিত্র হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিকভাবে সাতটি স্তরে নবীরা আছেন। মহানবী (সঃ)-কে মি'রাজে ঐসব স্তরের নবীদের দেখানো হয়েছিল। তিনি সবস্তর অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত এক স্থানে পৌছান। তাঁর উপর কোন নবী বা কোন ফিরিশ্তাও যেতে পারেন। তাঁর পরে শুধু আল্লাহ্ থাকেন। বলা হয় সেখানে একটি বরই গাছ আছে। এটাও শাব্দিক অর্থে ধরা উচিত নয়।

আমি আগেও একথা বলেছি যে, এটা একটা প্রতীক। আরব দেশে এ নিয়ম ছিল এবং এখনও অনেক দেশে এ নিয়ম আছে যে, জমি-জমার সীমানা চিহ্নিত করার জন্য কাঁটাওয়ালা গাছ ও ঝোঁপ লাগিয়ে দেয়া হয়। মি'রাজ এর বর্ণনার সময় যে বড়ই গাছের কথা বলা হয়েছে ওটার উদ্দেশ্যই এ বিষয় বুঝানো ছিল যে, সে জায়গার পর শুধুমাত্র আল্লাহ্র এখতিয়ার থাকে কেউ সে এলাকায় প্রবেশের অধিকার রাখে না। মোল্লারা এটা বুঝতে অক্ষম তাই ওরা বড়ই গাছকে অযথা এত গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সংকলন ও অনুবাদ
মরহুম আলহাজ্জ নুরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

হযরত আম্মাজান

মূলঃ সাহেবজাদী আমাতুশ শুকুর

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

তিনি এটাও বলতেন, প্রথম সন্তানের তরবিয়তের ব্যাপারে পুরো চেষ্টা-প্রচেষ্টা করো, অন্য সন্তানরা তার নমুনা দেখে নিজেরাই ঠিক হয়ে যাবে।

হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহেঃ) যাঁর তরবিয়ত হযরত আম্মাজানের কোলে হয়েছে তিনি বলছেন- হযরত আম্মাজানের এটা নীতি ছিল যে, তিনি সন্তানদেরকে মাগরীবের পর ঘরের বাহিরে থাকতে দিতেন না। এ নীতিকে তিনি দৃঢ়তার সাথে বাস্তবায়ন করতেন। এ নির্দেশ ছিল, মাগরীবের নামায পড়ে সোজা ঘরে চলে আসো, তারপর ঈশার নামায ছাড়া বাইরে যেও না। আর বড় হওয়া পর্যন্ত এ বাধ্যবাধকতা থাকতো। আর হযরত আম্মাজানের তরবিয়তের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তিনি তিরস্কার করে ধমকিয়ে কোন কথা বলতেন না। একবার আম্মাজান কিছু বাচ্চাকে খাবারের জন্য ডাকলেন (এটা তাঁর রীতি ছিল)। ঐ যুগে মাটিতে দস্তরখানা বিছিয়ে দেয়া হতো আর সবাই তাতে বসে খাবার খেত। আমাকেও বললেন-আস, সবার সাথে খাবার খাও। ঐ সময় আমার অল্প বয়স ছিল। তাই যেভাবে বাচ্চারা জিদ ধরে আমিও অল্প বয়সের দরুন না বুঝার কারণে অস্বীকার করে দিলাম। হযরত আম্মাজান ধমকানো ছাড়াই বললেন- 'ঠিক আছে খেও না, কিন্তু স্মরণ রেখ পরে আর খাবার পাবে না। অবশেষে কিছুক্ষণ সংকোচ বোধ করার পর আমিও ঐ বাচ্চাদের সাথে শরীক হয়ে যাই।

হযরত আম্মাজান তরবিয়তের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও খেয়াল রাখতেন যে, ঘরের বাচ্চারা ও অন্যান্য এতীমরা যারা তাঁর গৃহে লালন-পালন হচ্ছিল তারা যেন স্বচ্চরিত্রবান বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করে, যাতে তাঁদের উপর কোন মন্দ বাচ্চার খারাপ অভ্যাসের প্রভাব না পড়ে আর বাচ্চারা যেন মন্দ সহচর্য থেকে দূরে থাকে।

তিনি যখনই কোন বাচ্চার মাঝে মন্দ কোন বিষয় দেখতেন তখন এমনভাবে নসীহত করতেন যেন তার সংশোধন হয়ে যায় এবং অন্যের সামনে শুধু শুধু লজ্জাও না পায়।

হযরত আম্মাজানের হৃদয়ে শিক্ষকের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি এটা চেষ্টা করতেন যেন বাচ্চাদের হৃদয়ে শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রোথিত হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের শিক্ষকদের সম্মান প্রদর্শন করে। শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের শিক্ষক ছিলেন। একদিন তাঁর স্ত্রী হযরত আম্মাজানের পাশে বসা ছিলেন। মিয়া সাহেব ঐ সময় খুবই ছোট ছিলেন। তিনি একটি রাবারের সাপ এনে একবারে তার সামনে রেখে দিলেন। হঠাৎ সাপ দেখে তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। হযরত আম্মাজান এ অবস্থা দেখে তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, এটাতো রাবারের সাপ, তুমি এমনিতেই ভয় পাচ্ছ।" আর সাথে সাথে নিজের ছেলেকে বল্লেন-"মিয়া মাহমুদ উনিতো তোমার শিক্ষকের স্ত্রী। এটা তুমি কি করেছ?"

তিনি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন-

"আম্মা আমার ভুল হয়ে গেছে।"

সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতা ঃ

যদিও তরবিয়তের ব্যাপারে তাঁর কড়া দৃষ্টি ছিল তবুও অন্যদিকে তাঁর সন্তানদের প্রতি খুবই স্নেহ-মমতা ছিল। তাঁদের ছোট ছোট কথাকেও তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। নিজের সন্তান ছাড়াও জামাতের সব বাচ্চাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। সবাইকে নিজের সন্তানের মত মনে করতেন। তাদের খাইয়ে-দাইয়ে খুবই আনন্দিত হতেন। তাদের সাথে খোশ গল্প করতেন। কৌতুক শোনাতেন ও ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন। গল্প শুনাতেন। নিজেও খুব আগ্রহের সাথে শুনতেন। একদিন ইরফানী সাহেবের স্ত্রী যার উল্লেখ পূর্বেও এসেছে, আম্মাজানের কাছে আসলেন। ঐ সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদের (রাঃ) অল্প বয়স ছিলো, তাই তিনি হযরত আম্মাজানের পাশে বসা ছিলেন। আর আম্মাজান সেবিকাদের সর্দার থেকে গল্প শুনছিলেন। ইরফানী সাহেবের স্ত্রীকে দেখে বললেন, "মিয়া এখন তাঁর কাছ থেকে শুন।" হয়তো তিনি একটি গল্প শুনিয়েছিলেন যা মিয়া মাহমুদের খুবই পছন্দ হয়েছিল। পরবর্তী দিন যখন তিনি হযরত আম্মাজানের কাছে গেলেন তখন মিয়া মাহমুদ তাঁকে দেখে হযরত আম্মাজানের কোলে বসে বললেন- "আম্মাজান মাহমুদের আম্মা এসেছেন, তুমি তাঁকে গল্প শুনাতে বল।" আর বার বার বলতে লাগলেন। শেষে আম্মাজান বললেন, "বউ মা, তোমার কি খেয়াল হচ্ছে না, আমার ছেলে গল্প শুনতে চাচ্ছে?" তিনি বলেন, "আম্মাজান দিনে গল্প বলা কি ভাল লাগবে?" তিনি বলেন, "না, আমরা দিনেই গল্প শুনবো।" যখন তিনি গল্প শুনাচ্ছিলেন তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এসে উপস্থিত হলেন আর বললেন- "এটা কি বলা হচ্ছে?" হযরত আম্মাজান বললেন গল্প শুনছি। তিনি (আঃ) বললেন হ্যাঁ, হ্যাঁ এটা শুনাও। ছোটদেরকে গল্প শুনালে তাদের বুদ্ধি বাড়ে।"

হযরত আম্মাজান বাচ্চাদের ছোট ছোট কৌতুককে মন্দ আখ্যা দিতেন না। ছোট ছোট কথায় রাগ করতেন না। একবার আম্মাজানের নিকট চার বাচ্চা এলো। তিনি উঠলেন আর তাদের জন্য চালগুজা নিয়ে আসলেন। তাদের মাঝে যে সবচে ছোট ছিল সে খুবই দুর্বল ছিল। সে তার নিজের

বোনকে বললো-দেখ তাহেরা! চালগুজা খেয়ো না, আম্মাজান তোমাকে পেটুক মনে করবেন। হযরত আম্মাজান তার একথা শুনে খুবই হাসলেন আর বললেন-আমি তোমাকে মোটেই পেটুক ভাববো না, তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে খাও।

সম্মানিত আত্মীয়স্বজন ও সন্তানদের প্রতি ভালবাসা ঃ

তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের প্রতি খুবই ভালবাসা ছিল। বিশেষভাবে নিজের ভাই ও সন্তানদের প্রতি খুবই ভালবাসা ছিল। নিজের বউদেরকে মেয়ের মত ভালবাসতেন ও তাদের খেয়াল রাখতেন। সবার প্রয়োজনের দিকেও খেয়াল রাখতেন। আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দেওয়া, এবং তাদের পছন্দমত খাবার রান্না করে খাওয়ানো তাঁর অভ্যাস ছিল। প্রত্যেক ঈদে সবাই তাঁর মেহমান হতো। শেষ জীবন পর্যন্ত সবাইকে দাওয়াত করেছেন। এমনকি শেষের দিকে যখন তাঁর অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে গেল তখন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে ডেকে বললেন- "আমার শরীর এখন খুবই দুর্বল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমার কাছে থেকে কিছু টাকা নিয়ে খান্দানের লোকদের দাওয়াতের ব্যবস্থা কর। কেননা, এখন এটা আমার নিজের দ্বারা হচ্ছে না। সুতরাং মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন।

হযরত ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বলেছেন-হযরত আম্মাজানের নিজের ভাইদের কষ্ট খুবই অনুভূত হতো। যখন আমাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও জামাতের অন্যান্য সদস্যগণ আমার ইচ্ছা অনুযায়ী ডাক্তারী পড়ার পরামর্শ দেন। তখন আর্থিক সমস্যার কারণে আমি অসুবিধায় পড়ে গেলাম ও নিরাশ হয়ে গেলাম যে, এখন আমার ভর্তি সম্ভব হবে না। যখন আম্মাজান এটা অবগত হলেন তখন তাৎক্ষণিক বললেন- "তুমি উদ্দীপনার সাথে পড়তে যাও। আমি আমার নিজের খরচ থেকে তোমাকে টাকা দিবো। কেউ তা জানতে পারবে না। এমন কি হুযূর (আঃ) ও এটা জানবেন না।" এই কথা তিনি এজন্য বলেছেন যাতে মীর সাহেবের আত্মসম্মানবোধে আঘাত না লাগে। আর এভাবে আল্লাহ্তাআলার ফযলে মীর সাহেব তাঁর যুগের একজন বড় ও প্রসিদ্ধ সার্জন হয়েছেন। বউদের সাথে ব্যবহারের ব্যাপারে তাঁর বড় বউ হযরত উম্মে নাসের সাহেবা বলেন- আমার বিয়ের সময় এগার (১১) বছর বয়স ছিল। প্রথম দিন আম্মাজান আমাকে তাঁর নিজের সাথে ঘুম পাড়ালেন। আর বললেন, "ও তো বাচ্চা, ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।" পরেও তিনি আমাকে অনেক স্নেহ মমতা দিয়েছেন, আমার অনেক খেয়াল রেখেছেন। কিছুদিন অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তাঁর ভালবাসা এতোই বেড়ে গেল, আমি বাপের বাড়ির কথা ভুলেই গেলাম। যেন খোদা আমাকে এক মায়ের কোল থেকে বের করে অন্য মায়ের স্নেহ-মমতা ভরা কোলে পাঠিয়ে দিলেন।

সন্তানদের প্রতি ভালবাসার চিত্রটি হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা এভাবে বর্ণনা করেছেন-

তিনি সর্বোত্তম মা ছিলেন। তাঁর হৃদয় স্নেহ -মমতা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত বাচ্চাদের ছোট ছোট বিষয়েরও খেয়াল রেখেছেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ছোটবেলায় হাওয়াই মিঠাই যা পাঞ্জাবে "মাঈয়ী বুড়ীর ঝাটা" বলতো তা খুবই পছন্দ ছিল। তিনি যখনই কোন বাচ্চাকে এটা খেতে দেখতেন তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়ে এটা আনাতেন। আর বলতেন যাও, মিয়া মাহমুদকে দিয়ে আস। তার এটা খুবই পছন্দ। এমনিভাবে সর্বদাই তাঁর খাবারের প্রতি খেয়াল রাখতেন। এমনিভাবে যদি কোন জিনিস যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের পছন্দ তা প্রস্তুত হতো তাহলে বলতেন এটা আমার "বুশরার" পছন্দ। কেউ গিয়ে তাকে দিয়ে আস। তাঁর শেষ অসুস্থতার দিনগুলোতে যখন অধিকাংশ সময় নিদ্রাবস্থায় থাকতেন সেই সময়ও সন্তানদের খেয়াল রেখেছেন। একদিন মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব মনে করেন, যিনি ঐ সময় অসুস্থতার কারণে লাহোরে ছিলেন। আমাকে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন শরীফকে চা পান করাও যাতে তার মাথায় ব্যথা না হয়ে যায়।

হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা বর্ণনা করেন- আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি আম্মাজানের এতো ভালবাসা পেয়েছি যে, নিজের কষ্টকে ভুলে গেলাম। এমন মনে হয়েছে যে, আমি দ্বিতীয়বার মায়ের কোলে ফেরত এসেছি। যখন দেশ বিভাজন হলো, আর আমরা কাদিয়ান থেকে লাহোর আসলাম তখন কারও আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। একবার আমি বাজারে গেলাম। একটি কাপড় খুবই পছন্দ হলো, কিন্তু নিতে পারলাম না। ফেরত আসার পর কথা প্রসঙ্গে আম্মাজান অবগত হলেন, আর বলেন- "কোন দোকানে দেখেছ? কি রং ছিল?" সাধারণ কথাবার্তাই হচ্ছিল কিন্তু পরের দিন কি দেখলাম! ঐ কাপড়ের টুকরা আম্মাজান নিয়ে এসেছেন। আর বললেনঃ "এটা ধর, আর সেলাই করে পড়। কাল থেকে আমার ঘুম আসছিল না যে, আমার মেয়ে হৃদয়ে কষ্ট নিয়ে খালি হাতে ফেরত চলে এসেছে।" মোট কথা হযরত আম্মাজানের নিজের সন্তানদের ছোট থেকে ছোট ইচ্ছারও খেয়াল থাকতো আর সন্তানের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করতেন। (চলবে)

অনুবাদ - **শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন**

আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম
(আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম)
হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

১) খোদাতাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য বর্ণনা করা।

(২) খোদার সাথে বান্দার কি ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত বর্ণনা করা।

৩) কোন কোন কাজের মাধ্যমে বান্দা এ সম্পর্কের প্রকাশ করবে অথবা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে কী কী দায়িত্ব রয়েছে তা বর্ণনা করা।

৪) খোদাতাআলার সাথে সাক্ষাতের রাস্তা বা পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়া।

এ উদ্দেশ্যকে এই পার্থিব দুনিয়াতেই পূর্ণ করে দেখাতে হবে যেন মানুষ খোদাতাআলা সম্বন্ধে শুধু কাল্পনিক ধারণার গন্ডি পেরিয়ে পূর্ণ বিশ্বাসের ধাপ পর্যন্ত পৌছতে পারে।

ধর্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো- এটি মানুষকে পরিপূর্ণ ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিবে। এ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য নিম্নলিখিত সাতটি বিষয়ের বর্ণনা করা আবশ্যক -

১) উত্তম চরিত্র কি? ২) মন্দ চরিত্র কি? ৩) উত্তম চরিত্রের ক্রমধারা কী? ৪) মন্দ চরিত্রের ক্রমধারা কী? ৫) কোন বিষয়কে পাপ এবং কোন বিষয়কে নেকী কেন বলা হয়েছে ৬) যে সকল মাধ্যমের সাহায্যে মানুষ উত্তম চরিত্রকে অবলম্বন করতে পারে সেগুলো কী কী? ৭) সে সকল পদ্ধতি বা মাধ্যম কী যার সাহায্যে মানুষ মন্দ চরিত্র হতে বাঁচতে পারে?

উত্তম চরিত্রের বর্ণনায় এই সাত বিষয়ের বর্ণনা করা খুবই জরুরী; এছাড়া এই উদ্দেশ্য কখনও পূর্ণ হতে পারে না।

ধর্মের তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মানবজাতির সামাজিক প্রয়োজন মেটানো সামাজিক সমস্ত সমস্যার সমাধান করা। কেননা যেহেতু খোদাতাআলা মানুষকে সমাজবদ্ধ স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাই আবশ্যক যে, তিনি এমন সব নীতিগত নিয়ম-কানুন রাখবেন যদ্বারা দুনিয়াতে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক গোত্র ও ফিরকা যেন নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে থাকে এবং যেন কেউ কারো অধিকার জেনে বুঝে খর্ব করতে না পারে। যদি আমরা গভীরভাবে অবলোকন করি তাহলে দেখা যাবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ সামাজিক অধিকারের ব্যাপারে বর্ণনা করতে পারে না। কেননা সকলেই নিজের ফয়সালার কারণে সেই সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকে যা তার কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। সুতরাং এসব নিয়ম কানুনের বর্ণনা করা যা মানুষের সভ্যতার জন্য মূল ভিত্তি, ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ফারায়েজের অন্তর্ভুক্ত। যে ধর্ম এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে না তাকে কখনও প্রকৃত ধর্ম বলা যেতে পারে না। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর উপর দৃষ্টি রাখা যে কোন ধর্মের জন্য আবশ্যক।

১) গৃহস্থালী সম্পর্ক অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদেরকে পরস্পরের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা, কেননা এটি মানুষের সামাজিক বিধানের প্রথম ধাপ।

২) জাতীয় ও রাজনৈতিক অধিকারে, কোন উত্তম পদ্ধতিতে এগুলো পালন করা যেতে পারে।

৩) মালিক ও কর্মচারী অথবা ধনী ও গরীবের মধ্যকার সম্পর্কের উপর।

৪) এক ধর্মের লোকের অন্য ধর্মের লোকদের সাথে অথবা এক রাজত্বের লোকের অন্য রাজত্বের লোকদের সাথে যে ব্যবহার হওয়া উচিত, সেই ব্যবহারের উপর।

চতুর্থ উদ্দেশ্য হলো মানুষের পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করা অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, তার সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়াবলী বর্ণনা করা আবশ্যক।

মৃত্যুর পর কি মানুষের জন্য কোন জীবন আছে? যদি থাকে তাহলে কিরূপে?

ধর্মের তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মানবজাতির সামাজিক প্রয়োজন মেটানো, সামাজিক সমস্ত সমস্যার সমাধান করা। কেননা যেহেতু খোদাতাআলা মানুষকে সমাজবদ্ধ স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাই আবশ্যক যে, তিনি এমন সব নীতিগত নিয়ম-কানুন রাখবেন যদ্বারা দুনিয়াতে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদি জীবন থেকে থাকে তাহলে কি এই জীবনের সাথে কষ্ট বা আনন্দ সম্পৃক্ত থাকবে?

যদি সম্পৃক্ত থাকে তাহলে তার ধরণ কেমন?

মৃত্যুর পরও কি মানুষের জন্য মন্দ থেকে নেকীর দিকে যাবার কোন রাস্তা আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে কিভাবে?

উপরোক্ত চারটি উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কোন ধর্মের মূল শিক্ষাকে জেনেই তার দাবীর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। আমি এই উদ্দেশ্যাবলীর ব্যাপারে আহমদীয়াতের শিক্ষাকে এই আশা ও বিশ্বাসের সাথে উপস্থাপন করছি যে, যখন আপনারা ইনসাফের সাথে এতে গভীরভাবে দৃষ্টি রাখবেন তখন আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম এই চার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে না।

প্রথম উদ্দেশ্য
অর্থাৎ খোদাতাআলা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা

আমি পূর্বেই বলেছি, এই প্রবন্ধ চারটি প্রশ্নে বিভক্ত। তাই আমি পর্যায়ক্রমে চারটি প্রশ্নের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষাকে তুলে ধরছি।

১) প্রথম উদ্দেশ্যের ব্যাপারে প্রথম প্রশ্ন হলো- এই ধর্মে খোদাতাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়া হয়েছে?

মনে রাখা উচিত, ইসলাম খোদাতাআলাকে এক পরিপূর্ণ সত্তা বলে– যার মাঝে সকল গুণাবলী একত্রীভূত। সুতরাং কুরআন করীমের শুরুই হয়েছে এই শব্দ গুলো দিয়ে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন' সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য কেননা তিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। সুতরাং যেহেতু প্রত্যেক জিনিস তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁরই প্রতিপালনের মুখাপেক্ষী। এজন্য দুনিয়ায় অন্যান্য জিনিসে যেসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ই সেগুলোর প্রশংসা পাবার যোগ্য। কেননা এগুলো যা কিছু পেয়েছে আল্লাহ্‌তাআলার কাছ থেকেই পেয়েছে। এক মনোরম দৃশ্য, একটি সুন্দর ফুল, একটি সুস্বাদু খাবার, একটি নরম মোলায়েম বিছানা একটি সুমধুর আওয়াজ মোটকথা যেসব ভাল জিনিস রয়েছে সেগুলোকে মানবিক অনুভূতি অনুভব করে আনন্দ ও প্রশান্তি পায় সেগুলোর গুণাবলী মূলত আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন 'আর-রাহমান' বান্দার যেসকল প্রয়োজনের সম্মুখীন হবার ছিল এবং তার- যে ধরনের জিনিসের মুখাপেক্ষী হতো আল্লাহ্‌তাআলা তার সবগুলো পুরস্কার ও তাঁর ফযল হিসেবে সৃষ্টি করে রেখেছেন যেমন নূর ও আলো অথবা আগুন, পানি, হাওয়া, বিভিন্ন ধরনের খাবার ও ঔষধ, লাকড়ী, লোহা, পাথর মোটকথা মানুষের পরিশ্রম ও চেষ্টার জন্য তিনি দুনিয়াতে এমন সব জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন, মানুষ যে দিকেই মোড় নিবে

সেদিকেই নিজেকে ব্যস্ত রাখার ও জ্ঞান বাড়ানোর সুযোগ লাভ করবে। এমনকি মানুষের এমন কোন প্রয়োজন নাই যার উপকরণ আল্লাহ্‌তাআলা মানুষ সৃষ্টির পূর্বে এ দুনিয়াতে সৃষ্টি করে রাখেননি। এভাবে কুরআন করীম আল্লাহ্‌তাআলার নাম 'রাহীম' বলে থাকে। তিনি সমস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলাফল সঠিক ও উত্তমরূপে দিয়ে থাকেন। যে যেমন পরিশ্রম করে সে তার প্রতিদান তেমনই পায়। মানুষের পরিশ্রম কখনও বৃথা যায় না। বরং সর্বদাই তার ফল সৃষ্টি হতে থাকে।

এরপর বলেন খোদাতাআলা 'বিচার দিনের মালিক' অর্থাৎ তাঁর তরফ হতে প্রকৃতিগতভাবে যেসব পরিণাম বের হতে থাকে এবং যে সকল প্রতিদান মানুষ সাথে সাথেই পেতে থাকে এগুলো ছাড়া তিনি প্রত্যেক কাজের একটি অন্তিম সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে পৌছে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, নেক ব্যক্তি নেক প্রতিদান এবং মন্দ ব্যক্তি পাপের শাস্তি ভোগ করে নেয়। কিন্তু এই শাস্তি ও প্রতিদান খোদাতাআলার সিফতে মালিকিয়াত অনুযায়ী হয়ে থাকে। তিনি চাইলে ক্ষমাও করে দেন।

এভাবে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে উল্লেখ আছে তিনি 'ক্বাদীর' তিনি প্রত্যেক জিনিস ও প্রত্যেক জিনিসের ক্রিয়াশক্তি ও পরিণামের এক বিশেষ নিয়ম নির্ধারিত করে রেখেছেন, যে কারণে দুনিয়ার এই বিশাল কারখানা চলছে। যদি এই নিয়ম না থাকতো তাহলে দুনিয়ায় অন্ধকার ছেয়ে যেত। কেননা, মানুষ সম্পূর্ণভাবে কাজ ফেলে বসে থাকত। পাচক খাবার রান্না করার জন্য আগুন জ্বালায়, কেননা সে জানে, আগুন অবশ্যই উত্তাপ সৃষ্টি করবে। যদি পানির জন্য ভিজানোর নিয়ম না থাকত এবং আগুনের জন্য জ্বালানোর কাজ নির্ধারিত না থাকত– তাহলে আগুন কখনও উত্তাপ আবার কখনও শীতলতা সৃষ্টি করতো। পানি কখনও আগুন নিভাতো আবার কখনও আগুন লাগাতো; যদি এমন হতো তাহলে আজ মানুষ যেভাবে এগুলো থেকে উপকৃত হচ্ছে কক্ষণও হতো না বরং পরিণামে (জ্বালাবে না ঠান্ডা করবে-অনুবাদক) বিশ্বাস না হবার দরুণ তারা নিরাশ হয়ে বসে এবং ধ্বংস হয়ে যেত।

এভাবে তাঁর সিফতই বলে দেয়, তিনি 'আলীম' তিনি অণু পরিমাণ বিষয়ও জানেন। তিনি হৃদয়ের গোপন রহস্য এবং পর্দার আড়ালে লুকায়িত কথা এমনকি তিনি মানুষের ফিতরতের সেই সব গোপন রহস্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত যার সম্বন্ধে মানুষ নিজেই অবহিত। মাটির নীচে লুকায়িত অথবা পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপিত জিনিস তাঁর কাছে একই রকম। তিনি পূর্ববর্তী যুগের অবস্থাও জানেন, বর্তমান সম্বন্ধেও অবহিত এবং ভবিষ্যত যুগে যা কিছু হবে তাও তিনি জানেন। তিনি 'সামী' অর্থাৎ শ্রবণকারী। গোপন থেকে গোপন বিষয় তিনি জানেন, মৃদু হতে মৃদু কথা তিনি শোনেন। পিপড়ার চলার আওয়াজও তিনি শোনেন এবং মানুষের রগের ভিতর রক্ত চলার সময় যে আওয়াজ হয় তা-ও তাঁর শ্রবণের বাইরে নয়। তিনি 'হায়্যুন' অর্থাৎ তিনি নিজে জীবিত

ইসলাম দুনিয়ার সামনে এমন পরিপূর্ণ এক খোদাকে পেশ করে যিনি সেই দুটি বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখেন অর্থাৎ ভালবাসা ও ভয়ের উপকরণ যা ছাড়া পরিপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিই হতে পারে না।

থাকেন এবং অন্যদের জীবিত করেন। তিনি 'খালেক' অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেন। তিনি 'কাইয়্যুম' অর্থাৎ তিনি অন্যদেরকে স্বীয় সাহায্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং নিজেও প্রতিষ্ঠিত। তিনি 'সামাদ' অর্থাৎ কোন জিনিস তাঁর সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া জীবিত থাকতেই পারে না। তিনি 'গাফুর' অর্থাৎ মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে থাকেন। তিনি 'কাহ্‌হার' অর্থাৎ সবকিছু তার ক্ষমতার অধীনে। তিনি 'জব্বার' অর্থাৎ তিনি সব ধরনের ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলার সংশোধন করে থাকেন। তিনি 'ওয়াহ্‌হাব' অর্থাৎ তিনি নিজ বান্দাদেরকে প্রচুর পুরষ্কারাদীর অংশীদার করে থাকেন। তিনি 'সাব্বুহ' অর্থাৎ তাঁর মাঝে কোন ধরনের অপবিত্রতা নেই। তিনি 'কুদ্দুস' অর্থাৎ তিনি সকল ধরনের পবিত্রতার সমষ্টি, তাঁর তন্দ্রা আসে না আর না তিনি ক্লান্ত হন, সর্বদা হতে আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। তিনি 'মুহায়মেন' অর্থাৎ তিনি সবকিছুর হেফাযাতকারী। তিনি মানুষকে সেসকল দুঃখ কষ্ট ও বিপদ হতে রক্ষা করেন যা মানুষ জানেও না। মানুষ কতবার রোগাক্রান্ত হয় অথবা দুর্ঘটনায় পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর উপকরণ তাদেরকে এই কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। রোগের উদ্ভবের সাথে সাথে মানুষের দেহে তার জীবাণু বিনাশের উপকরণও তৈরি হতে থাকে। যতক্ষণ মানুষ সম্পূর্ণ উদাসীন ও প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ না করে তারা অনেক মন্দ পরিণাম হতে নিরাপদে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন 'ওয়া লাও ইউআখি-যুহুল্লাহুন্ নাসা বিযুলমেহিম মা তারাকা আলাইহিম মিন দাব্বাতিন।' (নহল রুকু-৬২)

মোটকথা 'লাহুল আসমাউল হুসনা' সমস্ত উত্ত ম নাম তাঁরই। এবং তাঁর রহমত সব কিছুর উপর বিজয়ী। যেমন তিনি বলেছেন 'রাহমাতী ওয়াসিয়াত কুল্লা শায়ইন' আমার রহমত অন্য সকল বিষয়ের উপর বিজয়ী। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার সিফতে গাযবিয়া তাঁর সিফাতে রহমতের অধীনস্ত। আল্লাহ্‌তাআলা 'আহাদ' অর্থাৎ কোন কিছু তাঁর সমতুল্য নয়– তিনি এক। সবকিছু তাঁর আদেশে উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনিই সবকিছুর সূচনাকারী। এভাবে কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলার অনেক নাম বর্ণনা করা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, ইসলাম দুনিয়ার সামনে এমন পরিপূর্ণ এক খোদাকে পেশ করে যিনি সেই দুটি বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখেন অর্থাৎ ভালবাসা ও ভয়ের উপকরণ যা ছাড়া পরিপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিই হতে পারে না।

অনুবাদ - মোহাম্মদ সোলায়মান

সন্তান লাভ

মহান আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আমি সালাউদ্দিন মাহমুদ প্রথম পুত্র সন্তান লাভ করি গত ১/১১/২০০৪ইং রোজ সোমবার দুপুর ১২টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, আল্ হামদুলিল্লাহ্। উক্ত পুত্র সন্তানের নাম ও ওয়াকফে নও তালিকার জন্য হুযূরের নিকট আবেদন করা হয়।

সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট আবেদন ভবিষ্যতে যেন এই নবজাত সন্তানকে জিন্দেগী ওয়াকফ করার তৌফিক দান ও হেদায়াত করে ইসলাম ও আহমদীয়াদে সৈনিক হিসাবে নিজেকে আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করতে পারনি সে জন্য বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থী। সে আমার তৃতীয় সন্তান।

নবজাতকের দাদা মরহুম মাষ্টার মহিউদ্দিন আহমদ ও নানা সাদেক ভূইয়া।

সালাউদ্দিন মাহমুদ
সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী, তাহরীকে জাদীদ
আহমদী মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ওকীলে আলা'র দফতর থেকে

প্রতি,

আমীর সাহেব
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

বিষয় ঃ **প্রত্যেক আহমদী উচিত অধ্যবসায়, সাহসিকতা, সামর্থের পূর্ণ ব্যবহার এবং দোয়ার মাধ্যমে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে অংশগ্রহণ করা।**

প্রিয় আমীর সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

গত ৮ অক্টোবর, ২০০৪ইং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) স্কটল্যান্ডের গ্লাস্‌গোতে অবস্থিত মসজিদ বায়তুর রহমানে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। উক্ত খুতবায় তিনি (আইঃ) দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর (আইঃ) সূরা আন-নাহলের ১২৬ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। যার অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক করবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তার পথ ছেড়ে সে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে সে বিষয়েও তিনি সবিশেষ অবহিত।"

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ এই আয়াত হতে আপনারা হয়ত বুঝে গিয়ে থাকবেন যে, আজ আমি কোন বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। কয়েক মাস পূর্বেও দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা প্রত্যেক আহমদীর মৌলিক কর্তব্য এবং এই বিষয়ে যতই মনযোগ আমরা আকর্ষণ করি না কেন তা যথেষ্ট নয়। যদি আপনারা সবাই এই কাজে যথাযথ মনোযোগ দেন এবং দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে অংশগ্রহণ করেন তাহলে দুনিয়াবী অর্জনের সাথে সাথে আপনারা আল্লাহ্‌র রহমতও লাভ করবেন। প্রকৃতপক্ষে সব পশ্চিমা দেশে ঠিক এই জিনিসটারই অভাব। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র উপর যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। ১৯৮৫ইং সনের ১০ মে ঠিক এই স্থানেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ) তাঁর **"দশ তারিখ, শুক্রবার" (Friday the 10th)** বিষয়ক প্রথম খুতবা প্রদান করেন।

"ঐ খুতবায় হুযূর (রাহেঃ) আমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সূরা ফাতিহার আলোকে জামাতকে বলেন যে, এই বীজ যা রোপিত হয়েছে তা অবশ্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং সুস্থ-সবল হয়ে উঠবে।" তাঁর বক্তৃতার শেষের দিকে হুযূর (রাহেঃ) বলেছিলেন যে, আজ সব আহমদীর প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, তারা ইসলামের বার্তাকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিবেন এবং এই কাজটি কেবলমাত্র দোয়া এবং চরম অনুরাগ ও উৎসাহের সাথে কাজ করার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা, দিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন, মানুষকে বুদ্ধিমত্তা ও ধার্মিকতার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করুন। নতুন নতুন উপায় বের করুন এবং মানুষের সাথে আপনার ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন। মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা শিকড় গেড়ে বসেছে সেগুলিকে দূর করুন। বৃদ্ধ এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় আচরণ করুন। তাদের সাহায্য করুন, উপহার দিন এবং কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করুন। তাদের নিকট মসীহ্ মাওউদের (আঃ) বার্তা তার নিজের ভাষায় পৌছান এবং এই কাজটি নিয়মিতভাবে করুন। পরিবেশ অনুযায়ী এবং সঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা করে ধর্মীয় বই-পুস্তক বিতরণ করুন। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে দৃঢ়তা, ধারাবাহিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদের অনুভূতিকে সম্মান করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের সাথে তাদের জ্ঞান ও মেধা অনুযায়ী কথা বলুন। আন্তরিকভাবে, সরল বিশ্বাসে এবং আল্লাহ্‌র নামে যে কথা বলা হয় তা সবসময়ই কার্যকর হয়। এই নীতিই সব নবীগণ তাঁদের বার্তা প্রচারের কাজে অবলম্বন করেছিলেন। যদি আপনারা পরিশ্রম করে নিজেদের ভিতরের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়ার মাধ্যমে এই কাজ করতে থাকেন তাহলে আল্লাহ্‌ও ধার্মিক লোকদের আপনাদের হাতে এনে দিবেন। ইনশাআল্লাহ্। এই কাজের জন্য আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

অতীতের কথা ভুলে যান, ভবিষ্যতের জন্য আমাদের নতুন করে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বলেছেন ঃ যখন কাউকে উপদেশ দিবেন সহানুভূতির সাথে দিন। একই বিষয় একইভাবে বললে কোন লোক আপনার শত্রু হয়ে যায়। আর ঐ বিষয়টি ভিন্নভাবে বললে ঐ লোকটি আপনার বন্ধু হয়ে যেতে পারে। অতঃপর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বলেন ঃ যে লোক কর্কশ এবং সহজে রাগান্বিত হয়ে যায় তার ভেতর থেকে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির কথা বের হতে পারে না। এমন ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তা থেকে বঞ্চিত থাকে।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ হযরত আলী (রাঃ) এর একটি কথা আছে যে, প্রত্যেক হৃদয়ের নিজ নিজ ইচ্ছা ও আকর্ষণ আছে। যার জন্য সে তাৎক্ষণিকভাবে কোন বিষয় শুনে এবং অন্য বিষয়ে শুনে না। সুতরাং লোকদের হৃদয়ের আকর্ষণের দিকে খেয়াল রেখে তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করুন এবং তখনই তাদের সাথে কথা বলুন যখন তারা শুনতে প্রস্তুত থাকেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ এম.টি.এ. দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র একটি বিরাট উপায় এবং আপনাদের এটিকে কাজে লাগানো উচিত। দাঈ-ইলাল্লাহ্‌দের আদর্শমূলক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত। তাদের উচিত সৎকর্ম করা এবং আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় করার সাথে সাথে বান্দার অধিকারও আদায় করা। প্রত্যেক আহমদীর উচিত নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করা যাতে জামাতের কোন সদস্য জামাতের তবলীগের পথে অন্তরায় হয়ে না যান।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ আমাদের অতীতের সকল গাফিলতি ক্ষমা করুন। চলুন আমরা আহমদীয়াত সুসংবাদ প্রচারের কাজে এগিয়ে যাই। এ কাজে প্রচুর পরিশ্রম এবং দোয়ার প্রয়োজন।

অনুগ্রহপূর্বক হুযূরের দেওয়া এই নির্দেশনা আপনার জামাতের সদস্যদের নিকট পৌছে দিন।

জাযাকুমুল্লাহ্
ওয়াস্‌সালাম
স্বাক্ষরিত
(চৌধুরী হামিদুল্লাহ্)
ওকীলে আলা
তাহ্‌রীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান, রাবওয়াহ্।
তাং-বৃহস্পতিবার, ১৪ অক্টোবর, ২০০৪ইং

অনুবাদক ঃ বশীর উদ্দিন আহমদ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) স্বাক্ষরিত ২৯.০৯.২০০৪ তারিখের জরুরী সার্কুলারের বঙ্গানুবাদ ঃ

মোকাররম আমীর সাহেব,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

কোনো কোনো লোকের পক্ষ থেকে এমন সব অভিযোগ পাওয়া যায়, যা থেকে বুঝা যায় কর্মকর্তারা তাদের উপর জোরপূর্বক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেন। এ জন্য সকল কর্মকর্তাকে এই হেদায়াত দিন তারা যেন কখনো কোনো প্রকার জোরপূর্বক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করেন। যদি কোন কর্মকর্তার বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে এরূপ করার কথা আমার গোচরীভূত হয় তাহলে ভবিষ্যতে ঐ কর্মকর্তাকে পদে বহাল রাখা হবে না এবং পরবর্তীতেও কোনো পদ লাভ করতে পারবেন না।

দ্বিতীয়ত যাদের সমস্যা সমাধানের জন্য জামাতীভাবে চেষ্টা করা হয়ে থাকে তাদের বিষয়ে ২-৩ মাস অন্তর রিপোর্ট নিতে থাকুন যেনো জানা যায়-সমস্যা সমাধানের পর সেখানে শান্তি বিরাজ করছে কি-না? না-কি সেখানে ভেতরে-ভেতরে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে যা প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মকর্তা এবং এমারতের বিরুদ্ধে কু-ধারণায় পরিণত হচ্ছে আর পর্যায়ক্রমে বাড়তে বাড়তে মরকযের (কেন্দ্রের) বিরুদ্ধেও কু-ধারণার সৃষ্টি করছে, যার ফলশ্রুতিতে নেযামের পবিত্রতার উপরেও প্রশ্ন উঠে।

আল্লাহ্তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে সবসময়ে জামাতের ব্যবস্থাপনা সু-রক্ষা করুন এবং বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সাহায্য ও সমর্থন করতে থাকুন, আমীন।

ওয়াস্সালাম
খাকসার
স্বাক্ষরিত
মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস

মিরপুরে তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুরে আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ০৫/১১/০৪ই থেকে ১১/১১/০৪ইং তারিখ পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী ৮ম বার্ষিক স্থানীয় তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস সম্পন্ন হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। গত ০৫/১১/০৪ইং শুক্রবার বাদ জুম্মা উদ্বোধনী অধিবেশনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা, জুলফিকার হায়দার, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা, জনাব সাইফুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট মিরপুর-২ এবং সভাপতিত্ব করেন কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুর, জনাব মুনাদিল ফাহাদ।

পর দিন হতে যথারীতি ৬ দিনব্যাপী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে শুদ্ধভাবে কুরআন নাযেরা, নামায শিক্ষা, তিনটি নতুন হাদীস, ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তক ও দ্বীনি মালুমাত অংশের উপর ক্লাস নেয়া হয়।

১১/১১/০৪ইং ২৭শে রমযান বাদ মাগরিব সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। সমাপনী অধিবেশনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট মিরপুর-২ হালকা, মুনাদিল ফাহাদ, কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুর। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মুনাদিল ফাহাদ
কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুর

হযরত হুদ (আঃ)

(পবিত্র কুরআনের আলোকে)

বহুকাল পূর্বে 'আদ' নামীয় এক জাতি আরব দেশে বাস করত। কোন এক সময়ে তারা বৃহত্তম আরবের অত্যন্ত উর্বর এলাকাসমূহ শাসন করত। বিশেষভাবে ইয়েমেন। সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার অঞ্চলগুলি। তারাই সর্বপ্রথম জাতি, যারা কার্যত প্রায় সমগ্র আরব দেশের উপর প্রভুত্ব করত। তারা আদ-আল-উলা' বা প্রথম 'আদ' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে মানবজাতি দুই ধরনের নাম দ্বারা পরিচিত হয়। একটি জাতীয় নাম আর একটি গোত্রীয় বা বংশীয় নাম। 'আদ' কোন একটি একক নাম নয়। কিন্তু কতগুলি গোত্রের সমষ্টিগত নাম যার বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন যুগে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এ শাখাগুলি তাদের শাখা সংক্রান্ত শিলালিপি রেখে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের সকল গোত্রই আদ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের রাজত্ব খৃষ্টপূর্ব পাঁচশত অব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের ভাষা ছিল এরামাইক যা হিব্রু ভাষার সমজাতীয়। এরামাইক রাজ্য সেমেটিক রাষ্ট্রের পতনের পরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা সমস্ত মেসোপটেরিয়া, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং ক্যালদিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারাও এই রাষ্ট্রের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) অব্যবহিত পরে 'আদ' এর উত্থান হয়। তারা খুবই উন্নত এবং ক্ষমতাশালী ছিল। তারা উচ্চস্থানসমূহ ও স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিল। আরব দেশে এই সকল বিশাল ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। এই জাতির ইতিহাস এখন প্রচ্ছন্নতায় ঢাকা পড়ে রয়েছে। শুধু তাদের স্থাপত্যের অট্টালিকাগুলির ভগ্নাবশেষই নজরে পরে। তারা যে অঞ্চলে বসবাস করত তাকে 'আহ্কাফ' বলা হয়। আহ্কাফের শাব্দিক অর্থ সর্পিল আকারে আঁকা-বাকা বালির পাহাড় সমূহ। এটা আরবের দুটি অংশের নাম। দক্ষিণাঞ্চলকে দক্ষিণ আহকাফ এবং উত্তরাঞ্চলকে উত্তর আহ্কাফ বলা হয়। এই ভুভাগদ্বয় খুবই উর্বর। কিন্তু মরুভূমির কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় মরু ঝঞ্ঝা প্রবাহিত স্তূপীকৃত বালুকারাশি দ্বারা এই অঞ্চলে বালির পাহাড় বা টিলা গড়ে উঠে। এই সকল বালির পাহাড় সম্ভবত ঝঞ্ঝাবাতাসপূর্ণ ধুলি ঝড়ের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল যা 'আদ' জাতির উপর আযাবরূপে পতিত হয়েছিল। তারা প্রচন্ড বায়ু প্রবাহের তীব্র ঝড়ের আঘাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাদের বাত্যাবিধ্বস্ত প্রধান প্রধান শহরগুলিকে স্তূপীকৃত ধুলা ও বালুকা রাশির টিলার নিচে ভু-গর্ভস্থ করে দিয়েছিল।

হযরত হুদ (আঃ)-এর ধর্ম প্রচার

আল্লাহ্তাআলা 'আদ' জাতির নিকট তাদের ভাই হযরত হুদ (আঃ) কে পাঠিয়েছিলেন। হযরত হুদ (আঃ) বংশপরম্পরায় হযরত নূহ (আঃ) হতে সপ্তম পুরুষ ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নাই; তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না আর জাতির প্রধানগণ বলল, নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।

তিনি বললেন, হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নাই, বরং নিশ্চয় আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন রসূল- আমি তোমাদেরকে আমার পয়গামসমূহ পৌছাচ্ছি; বস্তুত আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতোপদেশ দাতা। তোমরা কি এ কথায় বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্যে হতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশ বাণী এসেছে; যেন তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং স্মরণ কর যখন তিনি নূহের জাতির পর তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হও।

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট এর কোন পারিশ্রমিক চাইনা। আমার পারিশ্রমিক তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না? তোমরা আমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁরই দিকে পূর্ণরূপে অত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাবেন, এতে তোমাদের কৃষিকাজের জমিজমা চাষাবাদের জন্য উপকারে আসবে। কারণ কূপ-খালের মাধ্যমে পানি সেচের কোন ব্যবস্থা তোমাদের নেই। এবং তিনি তোমাদেরকে শক্তির পর শক্তিতে বৃদ্ধি করে দিবেন তোমরা অপরাধী হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট হতে মুখ ফিরিও না।

তারা বলল, হে হুদ! তুমি আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আন নাই এবং আমরা তোমার মুখের কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না এবং আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনয়নকারী হব না। আমরা এছাড়া আর কিছু বলি না যে, আমাদের উপাস্যগণের মধ্যে কেউ মন্দ অভিপ্রায়ে তোমাদের পিছু নিয়েছে। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাকে শরিক করছ তা হতে আমি মুক্ত। তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চ স্থানে শুধু বৃথা স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করছ? তোমরা এক শক্তিশালী এবং সভ্য জনগোষ্ঠী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছ এবং তোমরা কারুকার্য খচিত বড় বড় দূর্গ ও প্রাসাদতুল্য আট্টালিকা এবং বিরাট জলাধার নির্মাণ করছো। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পৃথক পৃথক বাসভবন তৈরী করেছ, তোমাদের কারখানা আছে এবং যান্ত্রিক পারদর্শিতাপূর্ণ কর্মকান্ড আছে। বিশালভাবে স্থাপত্য উন্নত ও সুদক্ষ হয়েছ। যেন তোমরা চিরকাল অবস্থান করতে পার। নতুন নতুন অস্ত্র ও যুদ্ধের সামগ্রী উদ্ভাবন করেছ এবং যখন তোমরা কাউকে ধর তখন নিষ্ঠুরদের মত ধর বিরাট সৌধসমূহ নির্মাণ করেছ। জাতিসমূহ তোমাদের প্রকৃত শক্তি পার্থিব বিষয়বস্তু হতে আহরণ করতে পারে না; বরং উচ্চ আদর্শ এবং সৎ নৈতিকতা হতে আহরণ করে থাকে। যেহেতু তোমরা নৈতিকভাবে দুশ্চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছ এবং তোমাদেরকে সংশোধন করণার্থে আমি সতর্কবাণী নিয়ে এসেছি। যেন তোমরা সতর্ক হও। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর; যিনি তোমাদেরকে এমন সব বস্তু দ্বারা সাহায্য করেছেন যার সম্বন্ধে তোমরা অবগত আছ। তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন গবাদি পশুসমূহ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা; নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা আযাবের দিবসের ভয় করছি।

তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছ যেন আমরা কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের উপাসনা করত তাদেরকে পরিত্যাগ করি, সুতরাং তুমি যে বিষয়ে আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছো যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি তা আমাদের নিকট আন।" তিনি বললেন, "অবশ্যই তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর শাস্তি ও ক্রোধ পতিত হয়েছে। তোমরা কি ঐ সকল নাম সম্বন্ধে আমার সাথে তর্ক কর, যেগুলি নামকরণ করেছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের অথচ আল্লাহ্ তাদের পক্ষে কোন দলিল নাযিল করেন নাই, অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর এবং নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

তারা বলল, 'তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও বা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। এটা পূর্ববর্তীগণের আচরণ বৈ কিছু নয়, আসলে আমাদেরকে কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। অতঃপর তারা এক ষড়যন্ত্র করল, তখন আরবদের প্রাচীন প্রথানুযায়ী কোন যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তি বা দলকে বিজয়ীর সামনে বন্দী অবস্থায় আনা হত। তখন সে বন্দীর মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরে বিজয় গৌরব প্রকাশ করত অথবা জয়োল্লাসের চিহ্ন স্বরূপ বন্দীদের মাথার চুল মুন্ডিয়ে ছেড়ে দেয়া হত। হযরত হুদ (আঃ) এর বেলাও তারা এরূপই করল। যখন তারা আযাবকে এক মেঘের আকারে তাদের উপত্যকাসমূহের দিকে অগ্রসর হতে দেখল তখন তারা বলল, এটা এক মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। হযরত হুদ (আঃ) বললেন, না, বরং এটা সেই আযাব যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছ এক বায়ু যার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিহিত আছে; যা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। ঐ দিন এর প্রতিপালকের আদেশক্রমে ভোর বেলা প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করে দিল। ফলে তাদের প্রভাত হল এমন অবস্থায় যে, তাদের গৃহগুলি ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হল না। অতএব তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নৈকট্য লাভের জন্য যাদেরকে মাবুদরূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদের কোন সাহায্য করল না। বরং তারা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এ ছিল তাদের মিথ্যা এবং যা তারা মিথ্যা রচনা করত তার পরিণতি ভয়াবহ ছিল। ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করবার উদ্দেশ্য ঐ ঝঞ্ঝা বায়ুকে তাদের উপর অবিরাম সাত রাত এবং আট দিনের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। অতএব তিনি সেই জাতিকে সেখানে ভূপাতিত অবস্থায় দেখতে পেলেন যেন তারা ভুলুণ্ঠিত খর্জুর বৃক্ষের কান্ড।

মৌঃ হেলাল উদ্দীন

ধর্মের দৃষ্টিতে কর্ম

আমরা আমাদের জীবনে কর্ম করি বেঁচে থাকার জন্য। জীবন ধারণ করার জন্য কর্মের প্রয়োজন আছে। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাবার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় ধর্মের বা এক কথায় সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের। কিন্তু আমরা অনেকেই ধর্ম এবং কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারি না। তাই অনেক সময় নিজের চেষ্টাকেই বড় মনে করি বা অন্য কথায় স্রষ্টাকে ছেড়ে দিই। আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে বা স্রষ্টাকে সর্বশক্তিমান ভেবে অলস হয়ে বসে থাকে। চেষ্টাহীন দোয়া কোন কাজে না আসার দরুণ শেষ পর্যন্ত মানুষ বে-দ্বীন ও ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। কেউ আবার ধর্মকে অনগ্রসরতার কারণ বলে মনে করে। তাদের মতে ধর্ম হলো পিছুটান। মানুষ এভাবে নানা মত-পথ আবিষ্কার করে। মানুষের জীবনের এই ব্যস্ত অনুপাত না মিললে অবশেষে আত্মহননের পথ পর্যন্ত বেছে নিতে দ্বিধাবোধ করে না কেউ কেউ। জীবন ও জীবিকা যেমন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ঠিক তেমনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্কও মনের অজান্তেই মানুষের নৈমিত্তিক চাহিদা। দর্শন শাস্ত্র পড়ে যদি কেউ মনে করেন খোদা নেই তাহলে সে হয়তো কিছুদিন স্বকপোলকল্পিত জ্ঞানে চলতে পারে কিন্তু অনন্ত কালের (মৃত্যুর পরেও জীবনের যাত্রা বহমান থাকে) জন্য সে নিঃস্ব ও ফকীর হয়ে যায়। ধূলায় ধূসরিত হয়ে থাকে সেসব নেচারী ভাগাড়ের দলগুলো। খোদার সান্নিধ্য-খোদার ভালবাসা লাভ কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন মানুষ সর্বান্তঃকরণে খোদার জন্য বাঁচে এবং খোদারই জন্য মরে। আর এদিক দিয়ে সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামুল আম্বিয়া, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অনুপম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তিনিই তো সেই মহান ব্যক্তিত্ব যিনি বলতে পেরেছিলেন-"ইন্নাসালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়্যা ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" অর্থাৎ আমার সব প্রার্থনা, নামায, রোযা ও তপস্যা জীবন মরণ সব কিছু বিশ্বের একমাত্র পরম প্রভু আল্লাহ্‌র জন্য।" যদি জীবনকে এবং মরণকে আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত জ্ঞান করা যায় তাহলে কর্ম করলেও ফল লাভের চিন্তা মাথায় আসবে না। অনাসক্ত জীবন মানুষকে নতুন জীবন দান করে। মানুষ তার আপন প্রভুর সত্তার সাথে বিলীন হয়ে গেলে তার কর্মও হয় একটি ইবাদত। নবীগণ খোদার প্রেরিত পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করতেন। নিজের হাতে নিজের কাজ করার জন্য নসীহত প্রদান করতেন। দাউদ (আঃ) বর্ম বানাতেন। মুসা (আঃ) পশু পালন করেছেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও নিজে মেষ চড়াতেন এবং ব্যবসায় করতেন। বাংলায় একটি কথা আছে - বেকার থাকার চেয়ে বেগার (কোন প্রাপ্তি ছাড়া) খাটা ভাল। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্‌পাক কর্মের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে,এরাই সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্টতম" (সূরা আন্ বাইয়্যেনা ঃ ৮)। কর্ম এমন হওয়া চাই যা হবে সততা হতে উৎসারিত। সৎ উদ্দেশ্যে এবং জীবন ও জীবিকার জন্য ধর্মানুমোদিত যে কোন কর্মই খোদার দৃষ্টিতে সম্মানিত। কামার, কুমাড়, মুচি, কৃষক কোন কাজই ছোট নয়। সততার সাথে কৃত সমস্ত কাজই মকবুল বা গ্রহণীয়। কিন্তু সেই সাথে মনে রাখতে হবে মহান সৃষ্টিকর্তার নাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন-

"নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত কর সবে" – এই আপ্ত বাক্যটি আমরা যেন কোনদিনই বিস্মৃত না হই।

"হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমাদেরকে জুমুআর দিনে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য তাড়াতাড়ি আস এবং ক্রয় বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র ফযল অন্বেষণ কর এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা জুমুআ ঃ ১০-১১)। যতই ব্যবসায়ে বা চাকুরিতে ব্যাঘাত ঘটুক, সময়মত আল্লাহ্‌র ইবাদতের হক আদায় করতেই হবে। ইসলাম প্রথমত পছন্দ করে ব্যবসায়। এটি স্বাধীন পেশা এবং অর্থ লাভের সম্ভাবনাও বিপুল। যে কোন সময় ধর্মের জন্য সময় ও অর্থ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরাই পারেন বেশি বেশি সফল হতে। পবিত্র কুরআন বলে "আল্লাহ্ ক্রয় -বিক্রয়কে হালাল করেছেন"(২ঃ২৭)। এরপরই আসে কৃষি কর্মের কথা। কৃষকদের কাজও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সম্মানীয়। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায়ই কৃষকের সাথে নেক বান্দাদের তুলনা করা হয়েছে। তারপর হল চাকুরীর স্থান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত খাদিজা (রাঃ) এর অধীনে কিছুদিন চাকুরী করেন। মুসা (আঃ) মিশর হতে চলে যাবার পথে হতাশ হয়ে বসে বসে দোয়া পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র দয়া হয়। সেখানে এক বাড়িতে তাঁকে কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। পরিশ্রম করলে এর প্রতিদানে আল্লাহ্ আরো বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন লোককে বসে থাকতে দেখতে পেলেন। তিনি ঐ লোকটির সাথে কোন কথা বলেননি। কিন্তু ফিরে যাবার সময় তার সাথে কথা বললেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনি যাবার পথে এই লোকটির সাথে কথা বলেননি কিন্তু আসার সময় বললেন। কারণটা কি? "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, যাবার সময় তাকে অলসভাবে বসে থাকতে দেখেছি তাই কথা বলিনি। কিন্তু আসার সময় সে মাটিতে আঁক কাটছিল। অর্থাৎ সে কিছু করার চেষ্টা করছিল।" আমরা এ কথার দ্বারা শ্রমের মর্যাদা বুঝতে পারি। ছোট ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সেই ঘটনা যেখানে একজন ভিক্ষুককে তিনি কুঠার কিনে দিয়ে কাজ করতে বলেছিলেন "নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত কর সবে" – এই আপ্ত বাক্যটি আমরা যেন কোনদিনই বিস্মৃত না হই। বাস্পাকুললোচনে সদাই যেন আমরা খোদার দরবারে প্রণত হয়ে প্রার্থনা করতে থাকি।

গীতায় কর্মযোগ অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

"লোকেহস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।

জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম॥৩

ন কর্ম ণামনারম্ভা ন্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে॥

ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি ॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্টত্য কর্মকৃৎ।

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগু ণৈ ঃ ॥ ৫

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার ঃ স উচ্যতে ॥ ৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যার ভতেহর্জুন।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যাকর্মণঃ।

শরীর যাত্রাপি চতে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার ॥ ৯"

অর্থাৎ - "(৩) হে অনঘ অর্জুন, ইহলোকে জ্ঞানাধিকারীগণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং নিস্কাম কর্মিগণের জন্য কর্মযোগ-এই দুই প্রকার নিষ্ঠার বিষয় সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি বেদমুখে বলিয়াছি।

(৪) কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেহ নৈস্কর্ম্য (নিষ্ক্রিয় আত্ম-রূপে অবস্থিতি, মোক্ষ) লাভ করিতে পারে না। কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি ও আত্মবিবেক না হইলে নৈস্কর্ম্যসিদ্ধি হয় না। কেবলমাত্র জ্ঞানশুণ্য র্কমত্যাগ দ্বারা উক্ত অবস্থা লাভ অসম্ভব।

(৫) কর্ম না করিয়া কেহই ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। অ-স্বতন্ত্র হইয়া সকলেই মায়াজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কর্ম করিতে বাধ্য হয়।

(৬) যে মূঢ় ব্যক্তি হস্ত, পদ ও বাক্যাদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনে মনে শব্দ রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় স্মরণপূর্বক অবস্থান করে তাহাকে মিথ্যাচারী বলে।

(৭) কিন্তু যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(৮) তুমি শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্য কর্ম কর। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়ঃ। কর্মহীন হইলে তোমার দেহ যাত্রাও নির্বাহ হইবে না।

(৯) ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব, তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে অনাসক্ত হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত সর্ব কর্ম কর।"

শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার জন্য কর্ম করার নামই ধর্ম। কর্মের মাঝেই ধর্মের বীজ লুকায়িত আছে। কর্মহীন ধর্ম বা ধর্মহীন কর্ম কোনটাই গ্রহণীয় নয়। সে মানুষের চিত্ত সংযত; যে স্বাভাবিক আসক্তি বা বিদ্বেষ সর্বোতভাবে পরিহার করে। এবং এ ধরনের কর্মানুষ্ঠানের ফলে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে যায়–চির প্রসারতা লাভ করে।

এখানে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই চোখে পড়ে কর্ম ও ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় সাধন। বেদে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে জ্ঞান ও কর্মের অনুশীলনের কথা। কাজ না করলে কেউ নিষ্ক্রিয় আত্মা লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ কাজের মধ্যেই কেউ যদি প্রকৃত ভগবানকে খুঁজে তাহলে সে কর্মরত হয়েও অসীম স্রষ্টার সন্ধান পাবে। অলস ব্যক্তি কখনো পরম সত্তার সন্ধান পেতে পারে না। কেননা কাজের মধ্যে স্বার্থের ব্যাপার আসে। সেখানে মন যদি নিঃস্বার্থ হতে পারে তাহলেই প্রকৃত সন্ন্যাস লাভ বা নৈস্কর্মসিদ্ধি হয়। জ্ঞানশুণ্যভাবে কর্মত্যাগ করলে ঐ অবস্থা বা মর্যাদায় উন্নীত হওয়া অসম্ভব। মূলত কর্ম ছাড়া কেউ থাকে না। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী প্রত্যেকেই কোন না কোন কর্ম করে। তবে সে সম্পর্কে জ্ঞান দ্বারা বুৎপত্তি অর্জন করলেই ধর্মানুযায়ী কর্ম পালন হয়। যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত মন বা আত্মা দ্বারা বিচার করে পঞ্চেন্দ্রিয় সংযত করে অনাসক্তভাবে কাজ করে যায় সে ব্যক্তি অবশ্যই অসার অচল অনঢ়ের চেয়ে উত্তম। তাই আমাদেরকে শাস্ত্র যে উপদেশ দেয় তদানুসারে নিত্য দিনের কর্ম করে যেতে হবে। কর্মই ধর্ম। দেহকে সবল ও সুঠাম রাখার জন্যও র্কম আবশ্যক। যে কর্মে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা স্মরণে থাকে না, সে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। যেমন সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, পরিজনকে যদি শুধুমাত্র এ কারণে লালন - পালন করা হয় যে, এরা ইশ্বর কর্তৃক তার উপর আদিষ্ট দায়িত্বাবলী; তাহলে তাদের মৃত্যু গৃহত্যাগ বা তাদের অন্যান্য কর্ম ঐ গৃহকর্তার মনে কোনই প্রভাব ফেলতে পারবে না। মূলত গৃহী হয়ে যিনি সন্ন্যাসী হন তিনিই নির্বাণ লাভ করেন। সন্ন্যাসযোগের ৩নং স্তবকে বলা হয়েছে, 'যিনি দুঃখ ও দুঃখের সাধনকে দ্বেষ করেন না এবং সুখ ও সুখের সাধনকে আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই রাগদ্বেষাদিশূন্য কর্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়াই জানিবে।"সাংখ্য যোগের ৪৫নং স্তবকে বলা হয়েছে,

"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যে ভবার্জুন।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

অর্থাৎ- "হে অর্জুন, বেদের কর্মকান্ড কামনামূলক ও সংসৃতিদায়ক। তুমি নিষ্কাম হও এবং ঈশ্বরার্থ কর্ম কর। তুমি সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত ও সদা সত্ত্ব গুণাশ্রিত হও এবং যোগ (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি) এবং ক্ষেমের (প্রাপ্তের রক্ষণের) আকাঙ্ক্ষারহিত ও অপ্রমত্ত হও।"

শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার জন্য কর্ম করার নামই ধর্ম। কর্মের মাঝেই ধর্মের বীজ লুকায়িত আছে। কর্মহীন ধর্ম বা ধর্মহীন কর্ম কোনটাই গ্রহণীয় নয়। সে মানুষের চিত্ত সংযত; যে স্বাভাবিক আসক্তি বা বিদ্বেষ সর্বোতভাবে পরিহার করে। এবং এ ধরনের কর্মানুষ্ঠানের ফলে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে যায়–চির প্রসারতা লাভ করে। গীতার সংখ্যাযোগের ৬৪নং স্তবকে বলা হয়েছে, "কিন্তু সংযতচিত্ত পুরুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া স্ববশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা অবর্জনীয় (দেহস্থিতি হেতু অপরিহার্য) বিষয়সমূহ পতিত তৃণের ন্যায় অনাসক্তভাবে গ্রহণ করিয়া চির প্রসন্নতা লাভ করেন।" (চলবে)

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

আমার স্মৃতিতে তারুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত

মরহুম মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন তার এত বড় প্রয়োজন কি? তারা বলল, সে আমাদেরকে বুঝাতে আসার জন্য ওয়াদা দিয়েছিল তাই আমরা সকলে বুঝার জন্য উপস্থিত হয়েছি। এখন তিনি পলাতক। মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেব বললেন, আপনারা সকলেই বুঝতে এসেছেন। তো মৌলানা সাহেবগণও কি ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে বুঝতে এসেছেন। সেখানে তো আমাদের অনেক লোক আছে বুঝাবার। সেখানে বুঝতে পারতেন। তখন তারা বলল, আমরা এখানে এসে বুঝতে দোষ কি?

মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেব প্রশ্ন করলেন, মৌলানাগণেরও কি কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যা আহমদীগণ হতে বুঝতে হবে। মৌলানাগণ সকলে চিৎকার করে বললেন, আমাদের কোন সন্দেহ নেই। হযরত ঈসা (আঃ) দুই হাজার বছর যাবৎ ৪র্থ আকাশে জীবিত আছেন এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। কুরআনে পাক হতে হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে যাওয়া সশরীরে তথায় জীবিত থাকা যদি দেখাতে পারেন। এর জন্য উভয় পক্ষের মুনাজারা হতে পারে। সকলেই উচ্চ স্বরে বলল, হ্যাঁ আমরা উভয় পক্ষের মুনাজারা চাই। মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেব বললেন, ভাল এ সম্বন্ধে কাগজে লিপিবদ্ধ হউক। সকলেই লেখা আরম্ভ করে দিলেন। ঠিক আছে এর জন্য স্থান, সময় ও সভাপতি নির্ধারিত হওয়া দরকার। সকলই এক সঙ্গে বলল, হাঁ হাঁ ঠিক আছে করুন, এখনই ঠিক করুন। মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেব বললেন, এ সভার সভাপতি কে হবে। মৌঃ তাজুল ইসলাম সাহেব বললেন, আমিই হব সভাপতি। মুন্সী সাহেব বললেন, উভয় পক্ষ কি আপনাকে সভাপতি মানতে পারে। আপনি কি কাদিয়ানী পক্ষের কাউকে সভাপতি মানতে পারেন। তিনি বললেন, কখনও না। মৌলানাগণ বললেন, আমাদের সভাপতি ছাড়া আমরা অন্য কাউকে সভাপতি মানতে পারি না। এমন বাহাসের আমাদের কোন দরকার নেই। সভা ভেঙ্গে দেয়া হল। বাহাসের সময়, স্থান ও তারিখ কিছুই ঠিক হল না। বাড়িওয়ালাকে মৌলানাগণ তিরস্কার করে নৌকাসহ ফেরত চলে গেলেন।

মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেবের মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলার অনেক অনেক অনুগ্রহ ছিল। তাঁর জ্ঞান ছিল পরিপক্ক। ধৈর্য ছিল অপরিসীম। লেখাপড়া কম জানলেও চিন্তা-শক্তি প্রখর ছিল। তাকওয়া ও আহমদীয়তের আদর্শ ভরপুর ছিল। তাঁর জীবনের বিস্তারিত ঘটনা লিখলে পৃথক পুস্তক হবে।

মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেব ১৯৬৩ সনের মার্চ মাসে আস্তে আস্তে দুর্বল হতে হতে মৌলার দরবারে চলে যান।

তিনি বয়াত করেছিলেন ১৯১৭/১৮ সনে। তাঁর বয়াতের সঙ্গে তাঁর পরিবারের অনেকেই বয়াত করেন।

আমরা দু'জন তাদের সভায় গিয়ে প্রথমে মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেব বললেন, আমরা ২ মাস পূর্ব হতে যে জলসার বিজ্ঞাপন দিয়েছি জলসা করব হুযূর কি তা মনে করে এখানে তসরিফ এনেছেন। আমাদেরকে বহাসের আহ্বান করছেন আমাদেরকে বুঝাতে এসেছেন না আপনি বুঝতে এসেছেন। প্রথম মৌলানা সাহেব ঝোঁকের সাথে বললেন আমরা বুঝতে এসেছি, বুঝতে চাই। মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেব প্রশ্ন করলেন, তবে কি আপনি সন্দিহান যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত না জীবিত। তখন মাওলানার টনক নড়ল। তিনি বললেন, আমি সন্দিহান হব কেন। হযরত ঈসা (আঃ) ৪র্থ আকাশে জীবিত আছে এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। তখন মুন্সী সাহেব বললেন, তাহলে তো প্রমাণ হচ্ছে আপনি আমাদেরকে বুঝাতে এসেছেন। কারণ, যাদের যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে তারা সেই বিষয় বুঝতে চায় আর যাদের যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না তারা কেন বুঝতে আসবে। আপনি বুঝাতে এসেছেন। আমরা বিজ্ঞাপনে যে সমস্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছি এ বিষয়ে যারা বুঝতে চান তারা জলসায় আসতে পারেন। তবে আপনি বুঝাতে এসেছেন এটাই সত্য। তো আমার দরকার আছে আপনার কাছে থেকে বুঝবার। আহমদীয়াত সত্য বুঝতে সময় লেগেছে এখন আহমদীয়াত মিথ্যা বুঝতে সময়ে লাগবে। আপনি কি এত সময় দিতে পারবেন। এর উত্তরে মাওলানা সাহেব বললেন, যাও যাও মিঞা তোমার প্যাচের কথা শুনার দরকার নেই। তখন মুন্সী সাহেব বললেন, তা হলে আমরা আমাদের নির্ধারিত মিটিং চালাতে যাব। তবে আপনি যখনই আমাকে বুঝাতে ডাক দিবেন বান্দা হাজির থাকব।

এটা ছিল মৈজদ্দিন মুন্সীর মৌঃ তাজুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে ২য় সাক্ষাত। ১ম সাক্ষাত ছিল আমাদের দক্ষিণের চিলোকোট গ্রামে। আমি এবং মৌঃ সামসুজ্জামান সাহেব যখন এলাকার প্রত্যেক গ্রামে তবলীগ করতে যেতাম তখন আমার তবলীগ পাগল মামা আফছর উদ্দিন মরহুম সাহেব কয়েকবার চিলোকুটে তাঁর মামার ও শ্বশুর বাড়িতে তবলীগ করতে নিয়েছেন। তখন আমাদের তবলীগের প্রভাবে অনেকেই আমাদের কথা শুনার আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। এ অবস্থায় মুন্সী ফজলুর রহমান সাহেব আমাদেরকে একটি তারিখ দেন যে, আশ্বিন মাসের ১৬ তারিখ আপনি আমাদেরকে বুঝাতে আসুন। আমরা সবাই মিলে আপনার কথা শুনব।

আমরা সরল মনে তার দেয়া তারিখে বাড়ি আসলাম। আল্লাহ্‌তাআলার মেহেরবানীতে ঐ তারিখের ২দিন পূর্ব হতে ভয়ানকভাবে আমার জ্বর ও আমাশয় দেখা দেয়। মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেব সকালে আমাকে দেখার জন্য আসেন এবং বলল মিয়া, তুমি চিলোকুটে তবলীগের তারিখ দিয়েছিলে। আমি সামসুজ্জামানকে সাথে নিয়ে চিলোকুট যাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা মৌলানা তাজুল ইসলাম সাহেবকে এনেছেন। তোমরা গেলে তোমাদিগকে জোর করে তওবা করিয়ে যেকোনভাবে তাদের দলে নিবে এবং তোমাদের তবলীগে বাধা সৃষ্টি করবে।

মরহুম মৈজদ্দিন সাহেব ও সামসুজ্জামান সাহেব সেখানে হাজির হয়ে দেখেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে দুই নৌকা বুঝাই করে মৌলানা ও মাদ্রাসার ছাত্ররা এসেছেন। তাদেরকে দেখে সকলে তরিৎগতিতে জিজ্ঞেস করল আমি যাই না কেন। মুন্সী মৈজদ্দিনের কথা ছিল সামসুদ্দিন সাহেব যেন কোন কথা না বলে। তিনি তাদের উত্তরে বললেন, তিনি অসুখে পড়েছেন। তারা তার কথা বিশ্বাস করল না। (শেষ)

ডাঃ আহমদ আলী

মধু : প্রকৃতির এক মহৌষধ

"এবং তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি ওহী করলেন যে, 'তুমি পর্বতমালা ও বৃক্ষসমূহে এবং তারা (মানুষেরা) যে মাচাসমূহ প্রস্তুত করে তাতে গৃহ নির্মাণ কর" (সূরা আন্ নাহ্‌ল ঃ ৬৯ আয়াত)।

বিখ্যাত মুসলমান চিকিৎসক ইবনে সিনা তার বিশ্বখ্যাত Medical test book the canon of Medicine-এ বহু রোগের প্রতিষেধক হিসেবে মধু ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন। তিনি মধুর উপকারিতা সম্পর্কে বলেছেন, মধু আপনাকে সুখী করে, পরিপাকে সহায়তা করে, ঠান্ডার উপশম করে, ক্ষুধা বাড়ায়, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও তীক্ষ্ণ করে, জিহ্বা স্পষ্ট করে এবং যৌবন রক্ষা করে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মধু ঃ দুই চামচ দারুচিনি গুঁড়া, এক চামচ মধু এক গ্লাস হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে সেবন করলে মূত্রথলির জীবাণু ধ্বংস হয়।

দাঁতের ব্যথা ঃ দাঁতে সার্বক্ষণিক ব্যথা হলে এক চামচ দারুচিনি গুঁড়া, পাঁচ চামচ মধু এক সঙ্গে মিশিয়ে ব্যথাযুক্ত দাঁতের গোড়ায় ব্যবহার করলে ব্যথা উপশম হয়। ব্যথা না সারা পর্যন্ত দিনে তিনবার ব্যবহার করতে হবে।

কোলস্টেরল ঃ দুই চা চামচ মধু এবং তিন চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া ১৬ আউন্স পানিতে মিশিয়ে কোলস্টোরলের রোগীকে সেবন করালে দুই ঘন্টার মধ্যে কোলস্টোরলের পরিমাণ ১০ শতাংশ কমিয়ে আনে। দিনে দুবার সেবন করলে যেকোন ধরনের কোলস্টোরলজনিত রোগ উপশম করে।

ঠান্ডা লাগা ঃ যারা সাধারণ বা তীব্র ঠান্ডায় ভোগে তাদের এক টেবিল চামচ হালকা গরম মধু ও এক চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে দিনে একবার করে তিন দিন সেবন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় ঠান্ডা, পুরনো কাশি উপশম হয় এবং সাইনাস পরিষ্কার করে।

পাকস্থলীর সমস্যা ঃ দারুচিনি পাউডারের সঙ্গে মধু মিশিয়ে সেবন করলে পাকস্থলীর ব্যথা ও গ্যাষ্ট্রিকজনিত ব্যথা উপশম হয় এবং পাকস্থলীর মূল থেকে আলসার ভালো করে।

হার্টের রোগ ঃ দারুচিনি গুঁড়া এবং মধু এক সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরী করে রুটির সঙ্গে জেলির মতো মাখিয়ে সকালের নাশতায় খেতে হবে। এটা ধমনীর কোলেস্টোরলের পরিমাণ কমায় এবং রোগীকে হার্ট এ্যাটাক থেকে রক্ষা করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঃ প্রতিদিন মধু ও দারুচিনি গুঁড়া সেবন করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে।

বদহজম ঃ দুই টেবিল চামচ মধুর ওপর সামান্য দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে খাবারের আগে সেবন করলে এসিডিটি কমে যায় এবং ভারী খাবার হজম হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ মধু ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু ধ্বংস করে।

ত্বকের ইনফেকশন ঃ মধু দারুচিনি গুঁড়া সমপরিমাণে মিশিয়ে একজিমা, দাউদ এবং অন্য সব ধরনের ত্বকের ইনফেকশনে আক্রান্ত স্থানে লাগাতে হবে। দিনে দুবার সাত দিন থেকে শুরু করে প্রয়োজনে এক মাস ব্যবহার করতে হবে।

ওজন কমানো ঃ সকালের নাস্তার আধা ঘন্টা আগে খালি পেটে এবং রাতে ঘুমাবার আগে মধু ও দারুচিনি গুঁড়া এক কাপ গরম পানিতে মিশিয়ে পান করতে হবে। নিয়মিত পান করলে স্থূলকায় শরীরের ওজনও কমতে থাকে। এই মিশ্রণ নিয়মিত পান করলে উচ্চমানের খাবার থেকেও শরীরে চর্বি জমতে পারে না।

ক্যান্সার ঃ সম্প্রতি জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ায় পাকস্থলী ও হাড়ের ক্যান্সার সফলতার সঙ্গে আরোগ্য লাভ করেছে। যেসব রোগী এ ধরনের ক্যান্সারে ভোগে তাদের ক্ষেত্রে এক টেবিল চামচ মধু ও এক চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া এক সঙ্গে মিশিয়ে দিনে তিনবার এক মাস সেবন করলে এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে।

ক্লান্তি ঃ ডা. মিল্টন যিনি এই গবেষণা করেছেন তিনি বলেন, এক গ্লাস পানিতে আধা টেবিল চামচ মধু এবং কিছু দারুচিনি গুঁড়া গ্লাসের পানিতে ছিটিয়ে দিয়ে সকালে ব্রাশ করার পর এবং বিকেল ৩টার দিকে পান করলে সাত দিনের মধ্যে শরীর সতেজ হয়ে উঠে এবং ক্লান্তি দূর হয়।

শ্রবণ শক্তি কমে গেলে ঃ যেসব রোগী কানে কম শুনে তাদের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ মধু ও দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে সকালে ও রাতে পান করলে শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পুড়ে গেলে ঃ খাটি মধু পোড়ার ওপর মুক্তভাবে নিয়মিত লাগালে পোড়ার জ্বালা বন্ধ করে, ব্যথা দূর করে এবং দ্রুত উপশম হয়।

বিছানায় প্রস্রাব করলে ঃ শিশুদের ঘুমানোর আগে এক চা চামচ মধু খাওয়ালে বিছানায় প্রস্রাব করা বন্ধ হয়।

অনিদ্রা ঃ এক গ্লাস দুধের মধ্যে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করলে ভালো ঘুম হয়। ঘুমের পর শরীর সতেজ হয়, কর্মে উদ্যম ফিরে পাওয়া যায়।

নাকের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া ঃ এক বাটি গরম পানিতে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে বাটির ওপর মাথা রেখে শ্বাসের মাধ্যমে গন্ধ নিতে হবে এবং বাটিসহ মাথা তোয়ালে নিয়ে ঢেকে নিতে হবে। এতে অত্যন্ত ভালো ফল পাওয়া যায়।

ক্ষত ঃ ক্ষত স্থানে মধু দ্বারা প্রলেপ দিয়ে বেঁধে নিলে খুব ভালো উপকার পাওয়া যায় এবং নিয়মিত ব্যবহার করলে কোনো এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না।

অস্টিওপোরসিস ঃ প্রতিদিন এক চা চামচ মধু পান করলে ক্যালসিয়াম ব্যবহারে সহায়ক হয় এবং অস্টিওপোরসিস রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। বিশেষ করে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের লোকের জন্য খুব উপকারী।

মাইগ্রেন ঃ হালকা গরম পানিতে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে মাইগ্রেন ব্যথার শুরুতে চুমুক দিয়ে পান করতে হবে। প্রয়োজনে ২০ মিনিট পরপর পান করতে হবে। এতে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

- মোঃ ইব্রাহিম খলিল
প্রাণরসায়ন ও আণবিক জীববিজ্ঞান বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সৌজন্যে ঃ প্রথম আলো ৫/৯/০৪

শুভেচ্ছা

আহমদী বুলেটিনের পাঠক ও শুভাকাঙ্খী ভাই-বোনদেরকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাই।

সেক্রেটারী ইশাআত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পবিত্র নবী সহধর্মিনীগন (রাঃ)

মূল ঃ মোকাররম হাদী আলী সাহেব

(দ্বিতীয় কিস্তি)

হযরত উম্মি সালমাহ্ (রাঃ)

এ বছরই অর্থাৎ ৪ হিজরীর সওয়াল (মার্চ - এপ্রিল ৬২৪ খৃষ্টাব্দ) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মি সালমাকে (রাঃ) বিয়ে করেন (তাবারী, যুরকানী, ৩য় খন্ড)। তাঁর আসল নাম হিন্দ। তিনি (রাঃ) কুরায়েশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আর এর আগে আবূ সালমা বিন আব্দুল আসাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি (রাঃ) একজন নিষ্ঠাবান ও পুরনো সাহাবী ছিলেন আর এ বছরই ইন্তেকাল করেছিলেন। যখন উম্মি সালমার ইদ্দত (অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট সময় যা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক একজন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে অবশ্যই পার করতে হয় এবং এর পরেই সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে) পার হলে পরে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজের জন্যে তাঁকে পসন্দ করেন। অতএব তিনি (সঃ) তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। প্রথমে তো উম্মি সালমা (রাঃ) নিজের কোন কোন অক্ষমতার কারণে কিছু ইতস্তত করেন এবং এ অসুবিধার কথাও উপস্থাপন করেন, 'আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে এবং আমি সন্তান ধারণের যোগ্য নই' (আসাবাহ্, যুরকানী এবং ইবনে সা'দ)। যেহেতু আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অন্য উদ্দেশ্য ছিলো এজন্যে শেষ পর্যন্ত তিনি (রাঃ) সম্মত হলেন। আর তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র মায়ের ওলী হলেন এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। হযরত উম্মি সালমা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। ইয়াজীদ বিন মুআবিয়ার যুগে ৮৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান (ইবনে সা'দ, তাহ্যীবুত্তাহ্যীব)। তিনি (রাঃ) উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মাঝে সবশেষে ইন্তেকাল করেন (যুরকানী ও আসাবাহ্)। হযরত উম্মি সালমা আবিসিনিয়া পর্যন্ত হিজরত করেছিলেন এবং মদীনায় হিজরত করার ব্যাপারে সকল মহিলার ওপরে প্রাধান্য রাখতেন (যুরকানী)। তিনি পড়তে জানতেন। মুসলমান মহিলাদেরকে তা'লীম তরবিয়ত দেয়ার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। হাদীসের পুস্তকে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা ৩৪৯। এদিক থেকে পবিত্র নবী সহধর্মিণীদের মাঝে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। আর সাহাবা ও সাহাবীদের সম্মিলিত সংখ্যার দিক থেকে তাঁর স্থান দ্বাদশ। তিনি (রাঃ) খন্দক, হুদায়বিয়া, খয়বর, ওয়াদিয়েল কুবা, ফিদক, মক্কা বিজয়, হুনায়েন, আওতাস এবং তায়েফের যুদ্ধগুলোতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সফরে সাহচর্যের সৌভাগ্য লাভ করেন। এদিক থেকে পবিত্র নবী-সহধর্মিণীদের মাঝে তাঁর অবস্থান প্রথমে। এ ছাড়াও আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহচর্যে তাঁর হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ হয়।

হযরত যয়নাব (রাঃ)

হিজরতের ৫ম বছর। শাবান মাসে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কিছু দিন আগে অর্থাৎ জমাদিউস সানী বা রজব মাসে (অক্টোবর-নভেম্বর, ৬২৬ খৃষ্টাব্দ) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত যয়নাব বিনতে জুহাশকে বিয়ে করেন। হযরত যয়নাব (রাঃ) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ফুফু আমীমাহ্ বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের মেয়ে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রথমে তাঁর এ প্রিয় বোন অর্থাৎ যয়নাব বিনতে জুহাশের বিয়ে নিজের মুক্তকৃত দাস ও পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)-এর সাথে দিয়েছিলেন। তাদের এ বিয়েটি টিকলো না। আর অবস্থা তালাক পর্যন্ত গিয়ে গড়ালো। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ (রাঃ) তালাক দিয়ে দিলেন। আর যখন হযরত যয়নাবের (রাঃ) ইদ্দত শেষ হলো তখন তাঁর ব্যাপারে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট ওহী হলো ঃ তাঁকে তোমার পরিণতসূত্রে আবদ্ধ করে নেয়া আবশ্যক। অতএব আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ

অর্থাৎ, "এরপর যায়েদ যখন তার (স্ত্রী) সম্বন্ধে (তালাক দেয়ার) ইচ্ছা পূরণ করলো, তখন আমরা তোমার সাথে তাঁর বিয়ে করালাম যেন মু'মিনদের জন্যে তাদের পালক পুত্রগণের স্ত্রীদের ব্যাপারে যখন তারা তাদের সম্বন্ধে (তালাক দেয়ার ইচ্ছা পূর্ণ করে নেয় তখন তাদের বিয়ে করতে) কোন সংকোচ না করে আর আল্লাহ্র ফয়সালা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল" (সূরা আহযাব ঃ ৩৮ আয়াতাংশ)।

মোট কথা এ ঐশী বাণী অবতরণের পরে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যয়নাবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং যয়নাবের কাছে যায়েদের মাধ্যমেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠান (মুসলিম, কিতাবুন্ নিকাহ্ বাব জওয়াজ যয়নাব বিনতে জুহাশ)। আর যয়নাবের পক্ষ থেকে সম্মতি লাভের পর তাঁর ভাই আবূ আহমদ বিন জুহাশ তাঁর পক্ষ থেকে ওলী হয়ে ৪শ' দিরহাম মহরানা ধার্যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ে করিয়ে দেন (সী'রাত ইবনে হিশাম)। বিয়ের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজ গৃহে দাওয়াতে ওলীমার (বৌ-ভাত) ব্যবস্থা করেন। যেহেতু উপরোক্ত বিশেষ অবস্থার কারণে এ বিয়ের বিশেষভাবে ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিলো তাই তিনি (সঃ) এ ওলীমা অনেক বড় আকারে ও বিশেষ গুরুত্বের সাথে করেন।

হযরত যয়নাব (রাঃ) ২০ হিজরী সনে ৫২ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তিনি খুবই দানশীলা ছিলেন। একবার আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পবিত্র সহধর্মিণীদের বললেন, "তোমাদের থেকে সে-ই (পরবর্তী জীবনে) সবচে' আগে আমার সাথে মিলিত হবে যার হাত লম্বা (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েলে যায়নাব)। হযরত আয়েশা বলেন, আমরা প্রাচীরের গায়ে রেখে হাত মাপতে লাগলাম তখন দেখা গেল সওদা (রাঃ)-এর হাত লম্বা কিন্তু

আমাদের মাঝে সবার আগে যয়নাব বিনতে জুহাশ ইন্তেকাল করেন। এতে আমরা জানতে পারলাম লম্বা হাত অর্থ যিনি সবচে' দানশীলা। (পরবর্তী জীবনে) তিনি সবার আগে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করেন (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)।

তিনি মক্কা বিজয়, হুনায়েন, আওতাস ও তায়েফ যুদ্ধে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সফর সঙ্গী ছিলেন। তদুপরি তিনি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত জোয়ায়রিয়া (রাঃ)

৫ম হিজরীর শা'বান মাসে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে গোত্রের যারা কয়েদী হিসেবে গ্রেফতার হয় গোত্র প্রধান হারিস বিন আবি যারার এর কন্যা বররাহ্-ও এর মাঝে ছিলেন। তিনি মুসাফা বিন সাফওয়ানের সাথে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মুসাফা বিন সাফওয়ান মারীসাহ্ যুদ্ধে মারা যায় (আসাবাহ্ ও যুরকানী)। কয়েদীদের বন্টনের সময়ে বররাহ্ বিনতে হারিস হযরত সাবেত বিন কায়েস (রাঃ) নামক একজন সাহাবীর ভাগে পড়েন (ইবনে সা'দ ও আবূ দাউদ, কিতাবুল 'ইতক্ব)। বররাহ্ স্বাধীন হওয়ার জন্যে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রাঃ)-এর সাথে এ মহান মুকাতা বাত করার সমঝোতা করে নেন যে, তিনি যদি এত পরিমাণ টাকা ফিদিয়া হিসেবে আদায় করে দেন তাহলে তাকে স্বাধীন করে দেয়া হবে। এ সমঝোতার পরে বররাহ্ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করেন আর এটা প্রকাশ করেন যে, তিনি বনী মুস্তালিক গোত্রের সর্দারের কন্যা। ফিদিয়ার টাকা শোধ করার ব্যাপারে সাহায্য চান। এতে তাঁর স্বকীয়তা এবং কৃতিত্বের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাচ্ছিলো। তাঁর এ বিবরণ শুনে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্ভবত এটা মনে করলেন, যেহেতু তিনি এক বিখ্যাত গোত্রের সর্দারের কন্যা এ সুযোগে তাঁর গোত্রে তবলীগের পথ সুগম হতে পারে। তাই তিনি তাকে মুক্ত করে বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। অতএব স্বয়ং তিনি তাঁর নিকটে বিয়ের প্রস্তাব দেন আর তাঁর পক্ষ থেকে সম্মতি লাভ করে তাঁর (সঃ) কাছ থেকে ফিদিয়ার টাকা আদায় করে দেন ও তাঁকে বিয়ে করেন (ইবনে হিশাম ও আবূ দাউদ, কিতাবুল ইতক্ব)। এ বিয়ে ৫ম হিজরীর শা'বান (ডিসেম্বর ৬২৬ খৃষ্টাব্দ) মাসে অনুষ্ঠিত হয়। সাহাবারা (রাঃ) যখন দেখলেন, তাঁদের প্রিয় নেতা (সঃ) বনু মুস্তালিকের নেতার কন্যাকে সহধর্মিণীর মর্যাদা দিলেন তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শ্বশুরকে নিজেদের হাতে কয়েদ করে রাখাকে তাঁরা নবীর মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করলেন। সুতরাং এভাবে একশ' গৃহবাসী অর্থাৎ শ' শ' কয়েদী ফিদিয়া ছাড়াই হঠাৎ মুক্ত হয়ে গেলো। এ প্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন, জোয়ায়রিয়া (আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বররাহ-এর নাম বদলিয়ে জোয়ায়রিয়া রেখেছিলেন) নিজ জাতির জন্যে বড়ই বরকতমন্ডিত সাব্যস্ত হয়েছিলেন, (ইবনে হিশাম, আবূ দাউদ, যুরকানী)। এ আত্মীয়তা আর এ অনুগ্রহের এই ফল প্রকাশ পেলো যে, বনু মুস্তালিকের লোকেরা শীঘ্র ইসলামের শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুগত দাসে পরিণত হলো।

হযরত জোয়ায়রিয়ার বিয়ের ব্যাপারে এমন একটি বর্ণনাও পাওয়া যায়, যখন তার পিতা তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর (সঃ) পবিত্র সান্নিধ্যে মুসলমান হয়ে গেলেন। পরে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রস্তাব পেয়ে স্বয়ং খুশী হয়ে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে কন্যাকে বিয়ে দেন (যুরকানী, ইবনে হিশাম)। অপর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, জোয়ায়রিয়ার পিতা হারিস আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি জাতির নেতা আমার কন্যাকে এভাবে কয়েদ করে রাখা যেতে পারে না। তিনি (সঃ) বল্লেন, জোয়ায়বিয়াকে জিজ্ঞেস করা হোক। সে যদি মুক্ত হয়ে যেতে চায় তাহলে আমরা তাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের সাথে থাকতে চাইলে আমাদের সাথে থেকে যেতে পারে। জোয়ায়রিয়ার কাছে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি মুসলমান হয়ে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে থাকাটা পসন্দ করলেন। তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করে নেন। এ সময় তাঁর (রাঃ) বয়স প্রায় ২০ বছর। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওযা সাল্লামের সাহচর্যে তাঁর হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ হয়।

হযরত জোয়ায়রিয়া (রাঃ) ৭টি হাদীস বর্ণনা করেন। প্রায় ৭০ বছর বয়সে ৫৬ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। (চলবে)

(দৈনিক আল্ ফযল, রাবওয়া ৩০-১০-২০০৩-তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

সন্তান লাভ

মহান আল্লাহ্তাআলার ফযলে খাকসার প্রথম পুত্র সন্তান লাভ করি গত ১/১১/২০০৪ইং রোজ সোমবার দুপুর ১২টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, আল্ হামদুলিল্লাহ্। উক্ত পুত্র সন্তানের নাম ও ওয়াকফে নও তালিকার জন্য হুযূরের নিকট আবেদন করা হয়। সে আমার তৃতীয় সন্তান।

সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট আবেদন–ভবিষ্যতে যেন এই নবজাত সন্তান আল্লাহ্র দরবারে জিন্দেগী ওয়াকফ করার তৌফিক দান ও হেদায়াত করে ইসলাম ও আহমদীয়াতের সৈনিক হিসাবে নিজেকে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করার সুযোগ পায় সে জন্য বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থী।

নবজাতকের দাদা মরহুম মাষ্টার মহিউদ্দিন আহমদ ও নানা সাদেক ভূইয়া।

সালাউদ্দিন মাহমুদ
সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী
তাহ্রিকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পর্দার শিক্ষা ও ব্যবহার সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার প্রধান মাধ্যম

পর্দা সম্পর্কে কুরআন করীমের ও হাদিসের উপদেশ সমূহ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা সূরা নূরের ৩১ ও ৩২ আয়াতে মু'মেন পুরুষ ও মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

তুমি মু'মেনদেরকে উদ্দেশ্য করে বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার কারণ হবে। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ ভালভাবে অবগত আছেন।

এবং তুমি মু'মেন নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল তা ব্যতীত যা এমনিতেই প্রকাশ পায়; এবং তারা যেন তাদের উড়নাগুলি নিজেদের বুকের উপর টেনে নেয়...আর তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা যেন সজোরে পা দিয়ে আঘাত না করে, এবং হে মু'মেনগণ! তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

আঁ হযরত (সঃ) নিম্ন লিখিত হাদিসসমূহে পর্দার ব্যাপারে পরিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন-

* হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, সীমাতিরিক্ত নির্লজ্জতা মানুষকে অসুন্দর করে এবং লজ্জা শরম মানুষকে সুন্দর ও সম্মানী করে। (তিরমিযী কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস্‌সিলাহ্‌)

* উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালেমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- আমি ও হযরত ময়মুনা (রাঃ) হযরত (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম, এমন সময় একজন অন্ধ সাহাবী 'উম্মে মাখতুম' (রাঃ) আসলেন, তখন হুযূর (সঃ) আমাদের দুজনকে পর্দা করার আদেশ দিলেন। আমি বললাম, সে কি অন্ধ নয়, যে আমাদেরকে দেখতেই পায় না? হুযূর (সঃ) বললেন, তোমরাও কি অন্ধ, যে তাকে দেখতে পাবে না? (মিশকাত কিতাবুন্‌ নিকাহ্‌)।

* হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন- দোযখীদের দু'টি এমন দল আছে যাদের মত কোন দল আমি দেখিনি। একদল তারা, যাদের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক রয়েছে যা দিয়ে তারা লোকদের আঘাত করে আর অন্যদলে এমন মহিলারা রয়েছে যারা কাপড় তো পড়ে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উলঙ্গ তারা যত্নের সাথে মোহনীয় চাল চেলে লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে, তাদের মাথা বড় উটের নমনীয় কুঁজের মত হয়ে থাকে, এদের কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না, এমন কি তারা এর (জান্নাতের) সুবাসও পাবে না, যদিও এ সুবাস অনেক দূর থেকে পাওয়া সম্ভব।

***এ সম্পর্কে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার আদেশসমূহ ঃ** পর্দা সম্বন্ধে কুরআন করীমের সূরা নূরের আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেন- খোদাতাআলা এই আয়াতে শুধু সতীত্ব অর্জনের এক উচ্চ শিক্ষাই দান করেননি বরং মানুষকে পবিত্র থাকার পাঁচটি পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন আর সেগুলো হল-

১) না-মাহ্‌রাম নারীদের দেখা থেকে পুরুষের চোখকে বাঁচানো।

২) না মাহ্‌রাম পুরুষের কণ্ঠ শ্রবণ থেকে নারীর কান বাঁচানো।

৩) না মাহ্‌রাম নারী- পুরুষ সম্পর্কে গল্প না শোনা।

৪) আলোচিত কুকর্মের সূচনাকারী সকল অনুষ্ঠান হতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।

৫) বিয়ে না করলে রোযা রাখা ইত্যাদি।

এখানে আমরা দাবির সাথে বলতে পারি, এই উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যমে কুরআন শরীফ এসবের প্রতিকার বর্ণনা করেছে। এ শিক্ষা শুধু ইসলামেই বিশেষভাবে রয়েছে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য, প্রকৃতিগত অবস্থা যা কামনা বাসনার উৎসস্থল এটা হতে মানুষ পৃথক হওয়া ব্যতীত পরিপূর্ণরূপে পরিবর্তিত হতে পারে না। এজন্যই তার কামনা-বাসনার অনুভূতি অনুকূল পরিবেশ পেলেই আর সংযত থাকতে পারে না বরং বলতে পারি, সে মহা বিপদে পড়ে যায়। এ জন্য আমাদের তাগিদ করা হয়েছে না-মাহ্‌রাম নারী ও তাদের সৌন্দর্যের স্থান সমূহকে কখনো না দেখতে ও তাদের সুরেলা কণ্ঠস্বর এবং সৌন্দর্যের বর্ণনা না শুনতে, তা পবিত্র বা অপবিত্র যে মনোভাবেই হোক। বরং আমাদের উচিত আমরা যেন এগুলো শোনা ও দেখা যার দ্বারা আমরা হোঁচট খেতে পারি, মৃত প্রাণীর মত ঘৃণা করি। কেননা, অবাধ দৃষ্টির ফলে যেকোন সময় পদস্খলন হতে পারে। সুতরাং যেহেতু খোদাতাআলা চান যেন আমাদের দৃষ্টি, মন ও মানসিকতা পবিত্র থাকে, তাই তিনি এই উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা দান করেছেন। খোলামেলা চলাফেরা পদস্খলনের কারণ, এর মধ্যে কি কোন সন্দেহ আছে? আমরা ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে নরম নরম রুটি রেখে দিয়ে যদি ভাবি কুকুরের মনে এই রুটি খাওয়ার কোন বাসনাই জাগবে না তবে এমনটি ভাবাই আমাদের ভুল হবে। সুতরাং খোদাতাআলা চেয়েছেন কুপ্রবৃত্তি যেন গোপন কাজ করার সুযোগও না পায় এবং এমন কোন উপলক্ষও যেন না আসে যাতে মন্দ আশঙ্কাসমূহ আন্দোলিত হতে পারে। ইসলামী পর্দার এটাই দর্শনতত্ত্ব এবং শরীয়তের বিধান। খোদার কিতাবে পর্দার উদ্দেশ্য নারীদের কয়েদীদের মত কারাগারে আবদ্ধ রাখা নয়, ইসলামী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তারাই এমনটি ভেবে থাকে। বরং পর্দার উদ্দেশ্য হলো নারী পুরুষ উভয়ে তাদের পরস্পরের সাথে অবাধ মেলামেশা ও পরস্পরের সৌন্দর্যের আকর্ষণ হতে বিরত থাকা, কেননা এতে নারী পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল রয়েছে। (ইসলামী নীতি দর্শন - রূহানী খাযায়েন- ১০ম খন্ড-৩৪৩ পৃষ্ঠা)।

*** জামাতে আহমদীয়ার খলীফাগণের এ সম্পর্কে উপদেশসমূহ ঃ**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) ২৫শে জুন ১৯৫৪ সালে করাচীতে তাঁর খুৎবায় বলেন- হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আওওয়াল (রাঃ) বলতেন- আজকাল আমাদের দেশে ঘুমটার পর্দা তুলনামূলকভাবে অধিক নিরাপদ। ... যাই হোক প্রত্যেকের (ধর্মীয়) বিধি-বিধানের (চেহারার পর্দা করার) উপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত, এবং যদি বলেন তার কর্মে দুর্বলতা পাওয়া যায় তবে তা দূরও করতে হবে। (আল ফযল ১৫ই এপ্রিল ১৯৬০)।

* হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) পর্দার বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে বলেন- কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত ইসলাম সম্মত পর্দা হচ্ছে মহিলাদের চুল, গর্দান ও কানের আগ পর্যন্ত চেহারা বা মুখমন্ডল ঢেকে রাখা, এই আদেশ পালন করতে বিভিন্ন দেশে তাদের অবস্থা ও পোশাক অনুযায়ী পর্দা করা যেতে পারে। (আল ফযল ৮ নভেম্বর ১৯২৪)।

* তিনি আরো বলেন, যারা বলে ইসলামে মুখ ঢাকার আদেশ নাই তাদের কাছে আমার প্রশ্ন (কুরআন করীম তো বলে সৌন্দর্য গোপন কর, আর সব চাইতে বড় সৌন্দর্য তো চেহারা বা মুখমন্ডলই যদি মুখ ঢাকার আদেশ না থাকে তবে) সৌন্দর্য কি, যা গোপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? নিঃসন্দেহে আমরা এ পর্যন্ত মেনে নেই যে, চেহারা এমনভাবে যেন ঢাকা হয়, যাতে তার স্বাস্থ্যে কোন খারাপ প্রভাব না পড়ে।

যেমন পাতলা কাপড় পড়া যেতে পারে অথবা আরবের মহিলাদের মত নেকাব বানানো যেতে পারে, যাতে চোখ ও নাকের ছিদ্র খোলা থাকে, কিন্তু চেহারা পর্দার মধ্যেই থাকে।

* হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) আরও বলেন, বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্ভড় পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে বানানো হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায় আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।

*হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন- কুরআন তাদেরকে (অর্থাৎ আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামাত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামাতের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল। (আল্ ফযল ২৫শে নভেম্বর ১৯৭৮)।

*তিনি নরওয়ের রাজধানী 'অসলোতে' এক অনুষ্ঠানে বলেন- যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কী সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।

*হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) বলেন- আল্লাহ্তাআলা খুব জোরালোভাবে আমার মনে আলোরন সৃষ্টি করে দিয়েছেন, আহমদী পর্দাশীল নারীরা যেন পর্দাহীনতার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে, কেননা যদি তারাও এ ময়দান ছেড়ে দেয় তবে দুনিয়ার আর কোন মহিলারা (ধর্মীয়) মূল্যবোধকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে? (আল ফযল ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) অপর এক স্থানে বলেন, বাড়ন্ত মেয়েরা তাদের মাথার চুল ঢেকে রাখা সম্বন্ধে মনে করে এটা সেকেলে বা মধ্যযুগীয় প্রথা। এজন্য তারা স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র দরবারে না এসে ভগ্ন হৃদয়ে আসে, আর তারা বলতে থাকে, হে খোদা তুমি আমাদেরকে ইহুদী মহিলাদের মাথার শেষ অংশে ছোট টুপি পড়ার ন্যায় উড়না আবৃত অবস্থায় গ্রহণ কর, এবং তুমি আমাদের পক্ষ থেকে বাড়ানো অপূর্ণ পদক্ষেপকেও গ্রহণ কর। কিন্তু তোমরা সবাই যদি এগুলো আল্লাহ্র জন্য করে থাক তবে এটি একদম ঠিক নয়। কেননা মনে রেখ, চুল মহিলাদের দেহাবয়বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ, বিশেষ করে যখন সামনের দিকে ঝুলে থাকে। কিছু সংখ্যক মেয়েকে আমি দেখেছি যখন তারা উড়না মাথার উপর দেয় তখন এমন ভাবে দেয় যেন তাদের চুল সামনের দিকে বেরিয়ে থাকে (এমনটি করে সে মনে করে যে) এখন আমাকে দুই সমাজেরই সদস্য মনে হচ্ছে (অর্থাৎ পশ্চিমা ও মুসলমান উভয়ই)। আমি যে বিষয়ে তাকিদ করতে যাচ্ছি তা হলো- উড়না পড়া বা পর্দা করার আগে আপনারা নিজেদের কাছে নিজেরা প্রশ্ন করবেন, আমি খোদাকে বেশি পরোয়া করি না মানুষকে? যদি উত্তর এমন হয়, আমি মানুষের চাইতে খোদাকেই বেশি পরোয়া করি তবে আপনি মানুষের বাহবা পাবার আশা থেকে মুক্ত হবেন। তারা যা-ই বলুক তাতে আপনার কিছু আসে যায় না, কেননা শুধু আল্লাহ্ই চিরস্থায়ী।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনাদের উড়না পড়া বা পর্দা করার পূর্বে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা উচিত, যদি আপনার মাথার চুল সম্বন্ধে ফয়সালা হয়, আল্লাহ্তাআলা আমাদের সম্বন্ধে কী বলেছেন আমি শুধু সে বিষয়েরই পরোয়া করি, তখন আপনি মানুষের কথার এক বিন্দু পরিমাণও পরোয়া করবেন না।

*হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) ১৯৮২ সালের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেওয়ার সময় পর্দা সম্বন্ধে ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন। উম্মুল মু'মেনীনগণ এবং অন্যান্য অনেক মহিলা পর্দার মধ্যে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন।

হযরত খাওলা (রাঃ) এর ঘটনা যা আপনাদের অনেকেরই জানা আছে। আর তা হলো- হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) কে একবার রোমানদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যাতে রোমানদের সৈন্য সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, মুসলমানদের যে কোন ধরনের বড় রকমের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যুদ্ধের সময় মুসলমানরা এক ঘোড়ায় আরোহণকারী যোদ্ধাকে মুখঢাকা বর্ম পড়া অবস্থায় দেখতে পেল। সে ঘুরে ঘুরে শত্রু-সেনাদের উপর আক্রমণ করছিল আর যে দিকেই যাচ্ছিল শত্রুদের মেরে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছিল আর কাতারগুলো ভেদ করে মেরে মেরে এদিক ওদিকে বেড়িয়ে যাচ্ছিল। মুসলমান সৈন্যরা তাকে দেখে পরস্পর বলাবলি শুরু করল ইনি তো আমাদের নেতা খালেদ বিন ওয়ালীদ (সাইফুল্লাহ্) ছাড়া আর কেউ না। এমন সময় তারা হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে আসতে দেখে আশ্চর্য হলো এবং তাকে বললো, হে আমাদের সর্দার এই ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা কে? তিনি উত্তর দিলেন আমারও জানা নেই। আমি তো এমন বীর ও বাহাদুর যোদ্ধা এই প্রথম দেখলাম। ইতিমধ্যে সেই ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরল এবং তার ঘোড়াও ক্লান্ত ছিল। সে ঘোড়া হতে নামলে খালেদ, বিন ওয়ালীদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে ইসলামের মুজাহিদ! তুমি কে? আমার মন তোমাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছে, তোমার মুখ থেকে নেকাব উঠাও কিন্তু তিনি এর কোন তোয়াক্কা করলেন না। তিনি নেকাবও উঠালেন না এবং বর্মও খুললেন না। খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) হয়রান হয়ে গেলেন যে, এত বড় যোদ্ধা কিন্তু আনুগত্যের এমন খারাপ অবস্থা! তিনি পুণরায় বললেন হে যুবক! আমি তোমাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছি, তোমার চেহারা থেকে নেকাব উঠাও। এতে হযরত খাওলা (রাঃ) বললেন, হে আমার মালিক! আমি অবাধ্য নই, কিন্তু আল্লাহ্তাআলা আমাকে এই হুকুম দিয়েছেন যে, তুমি বেপর্দা হবে না। আমি একজন মহিলা আর আমার নাম খাওলা। যাই হোক সে নেকাব উঠাল না। (ফায়াজুল ইসলাম অনুবাদ-ফুতুহুশ শাম ৯৮-১০১ পৃষ্ঠা)।

*হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কিছুদিন পূর্বে মোহতরমা সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্, রাবওয়াকে চিঠির মাধ্যমে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন, বোরকার মাঝেও যেন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন- নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে শরীয়তের এই হুকুম পালন করার এবং প্রকৃত পর্দাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার তৌফিক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ - মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম

ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

'ওয়াকফে জাদীদ' এর তাহ্‌রিক নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী তাহ্‌রিক। যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস্‌সানী আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ১৯৫৭ইং সনে ঘোষণা করেন।

মহান আল্লাহ্ পাকের খলীফাগণ যেহেতু আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন তাই তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পরিচালিত হন এবং আমল করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং (সময় উপযোগী) সৎকর্ম করেছে। এরাই সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্টতম।" (সূরা আল বাইয়্যেনা-৮ আয়াত) এরূপ আয়াত অনুযায়ী যুগোপযোগী একটি তাহ্‌রিক হলো ওয়াক্‌ফে জাদীদ।

সারা বিশ্বব্যাপী যখন সত্যিকার ইসলাম তথা আহমদীয়তের প্রচারের ফলে ইসলাম প্রচারিত হতে থাকে তখন ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহ ব্যাপকভাবে নতুন সম্প্রসারিত এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া জরুরী হয়ে পড়ে। ঠিক এমনই যুগ সন্ধিক্ষণে 'ওয়াকফে জাদীদ' নামক এ গুরুত্বপূর্ণ তাহ্‌রিকটি করা হয় তালীম ও তরবীয়তের উদ্দেশ্যে।

আহমদীয়তের সুচনায় ওয়াকফে জাদীদের অবস্থান ঃ

'ওয়াকফে জাদীদের' কথা বলতে গেলে আমাদের সচরাচর ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে হয় আর তা হলো 'বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়।' তেমনিভাবে 'ওয়াকফে জাদীদ' এর বৃক্ষটি আহমদীয়তের গোড়াপত্তনকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজেই করে গেছেন। তিনি (আঃ) এ প্রসঙ্গে নিম্নরূপ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন ঃ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এই অধমের ইচ্ছা আছে যেন দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য একটা উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যাতে উপমহাদেশ হিন্দুস্থানের দেশগুলোর বিভিন্ন স্থানে আমাদের তরফ হতে উপদেশবিদ, তর্কবিদ ও বক্তা মনোনীত করা হয়। যারা খোদার বান্দাদিগকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানায় ও ভূপৃষ্ঠে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বর্তমানে জামাতের দুর্বলতা এবং সংখ্যার স্বল্পতার দরুণ আপাতত এ ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে পারছে না। এ সময় এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যে, যদি হযরত মৌলবী মুহাম্মদ আহসান আমরোহী যিনি একজন বড় আলেম, ফাযেল, বিশ্বস্ত মুত্তাকী এবং ইসলামের মহব্বত অন্তর দিয়ে নিষ্ঠার সাথে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে যতটুকু সম্ভব কিছু খেদমত তাঁকে সোপর্দ করা যেতে পারে।

এই মৌলবী সাহেব শিশুদের তালীম ও তরবীয়ত, কুরআন হাদিসের দরস, ওয়াজ-নসীহত এবং যুক্তি সহ তর্ক করাতে বিশেষ পারদর্শী। বড়ই আনন্দের বিষয় হবে যদি তিনি এ মহৎ কাজে যোগদান করেন। কিন্তু যেহেতু; মানুষের সন্তান সন্ততি থাকলে রোজগার ছাড়া চলে না, তাই এ বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন যে, মৌলবী সাহেবের জীবনের জন্য উত্তম ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ জন্য আমাদের জামাতের যারা সামর্থবান তারা যেন মৌলবী সাহেবের জীবন যাত্রার জন্য স্থায়ীভাবে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী কিছু চাঁদা ধার্য করেন এবং রীতিমতভাবে তাঁর কাছে ধার্য করা চাঁদা পাঠিয়ে দেন আল্লাহ্‌তাআলা যতদিন অন্য ব্যবস্থা না করেন ততদিন পর্যন্ত।

মনে রাখা উচিত যে, দুনিয়া কিছুকালের জন্য মুসাফিরখানা স্বরূপ, পরকালের জন্য পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করার জন্য দিবা-রাত্রি ব্যস্ত থাকে।

মনে রাখা উচিত যে, দুনিয়া কিছুকালের জন্য মুসাফিরখানা স্বরূপ, পরকালের জন্য পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করার জন্য দিবা-রাত্রি ব্যস্ত থাকে। এ বিজ্ঞপ্তি পড়ার পর যে সব বন্ধু চাঁদা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হন তারা যেন এ অধমকে অবহিত করেন।

আহবায়ক
খাকসার
২৬ মে, ১৮৯২ইং গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, গুরুদাসপুর

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি পড়লে অবগত হওয়া যায় যে, ওয়াকফে জাদীদ এখন থেকে এসে বর্তমান রূপ লাভ করেছে হযরত আল্ মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর ঘোষণার মাধ্যমে। যে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও এই বিজ্ঞাপণ অনুযায়ী পূর্ণতা লাভ করেছে ওয়াকফে জাদীত হিসাবে, আল্ হামদুলিল্লাহ্।

ওয়াক্‌ফে জাদীদ কি?

'ওয়াকফে জাদীদ' শব্দদ্বয় উর্দূ থেকে নেয়া হয়েছে। এর 'ওয়াকফে' শব্দের অর্থ- উৎসর্গ আর 'জাদীদ' শব্দের অর্থ নতুন পরিকল্পনা। একত্রে ওয়াকফে জাদীদ-এর অর্থ দাঁড়ায় **উৎসর্গকরণের নতুন পরিকল্পনা**। মানুষ যেমন কোন সুদূরপ্রসারী কার্যক্রমে পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে তেমনি আল্লাহ্‌র রাহে নিজ জীবন উৎসর্গ করণের এটি একটি নুতন পরিকল্পনা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জীবন উৎসর্গ করার বিষয়ে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, "...যদি কেহ মুক্তি চায় এবং পবিত্র জীবনের ও চিরস্থায়ী জীবনের অন্বেষণকারী হয় তবে সে যেন আল্লাহ্‌র জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে..।" (মলফুযাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা-৩৮০)।

তিনি (আঃ) অন্যত্র বলেন, "যে ব্যক্তি তার অস্তিত্বকে খোদার সামনে রেখে দিবে এবং নিজের জীবন তাঁর পথে উৎসর্গ করবে এবং পুণ্য কাজ করার ক্ষেত্রে আগ্রহী হবে সে খোদার নৈকট্যের উৎস হতে তার পুরস্কার লাভ করবে। এই সকল লোকের না কোন ভয় আছে আর না কোন চিন্তা আছে।" (সিরাজ উদ্দীন খৃষ্টান কা চার সওয়াল কা জওয়াব পৃষ্ঠা-১৮)।

এভাবে আমরা জানতে পারি ওয়াকফে জিন্দেগী কত বড় মাহাত্ম্যপূর্ণ। যার সকল কর্মকান্ড কেবল আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সম্পন্ন হবে ফলে তার ভয় ও দুঃখ থাকবে না। এ সকল উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আহমদীয়া জামাতের

সদস্যগণের তালীম তরবীয়তের জন্য ভারত, পাকিস্তান, (বাংলাদেশ) এর অভ্যন্তরে কাজ করার উদ্দেশ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ তাহ্‌রিক হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ১৯৫৭ইং সনে ২৭ ডিসেম্বর করেন আহমদীয়তের ইতিহাসে একেই 'ওয়াকফে জাদীদ' বলে।

'ওয়াকফে জাদীদ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

প্রতিটি জিনিস এর ক্ষেত্রে বা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পিছনে কোন না কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে ঠিক তেমনি 'ওয়াকফে জাদীদ' প্রতিষ্ঠার পিছনে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি (রাঃ) লক্ষ্য করলেন সারা বিশ্বব্যাপী আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে সত্যিকার ইসলাম তথা আহমদীয়াত অতি দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছে কিন্তু তদ্রুপ দ্রুততার সাথে তালীম তরবিয়ত এর মান এর প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি (রাঃ) ইসলাম এর প্রসারতার সাথে তালীম তরবিয়তীর মানকে সমন্বয় সাধন কল্পে 'ওয়াকফে জাদীদ' এর তাহ্‌রিক করেন।

এই তাহ্‌রিকের ফলে গ্রাম-গঞ্জ তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান, (বাংলাদেশ) অভ্যন্তরের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ নিজ জীবন ওয়াক্‌ফ করে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে মুয়াল্লিম হিসাবে বিভিন্ন এলাকায় খেদমত করবে–যেন শিশুদের, নও মোবাঈনদের ও শিথিলদের তালীম তরবিয়তের মাধ্যমে আমলী ও আখলাকী মান সমুন্নত হয়।

অপরদিকে এ কাজের জন্য অন্যরা টাকা পয়সা, জায়গা-জমি, সম্পদ এই খাতে দান করবেন যেন প্রক্রিয়াটি চালু থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এখনও এ লক্ষ্য সদা বাস্তবায়িত হয়ে চালু আছে, আল্ হামদুলিল্লাহ্।

ওয়াকফে জাদীদ এর আর্থিক বছর ও আমাদের করণীয় ঃ

'ওয়াকফে জাদীদের' আর্থিক বছর ১লা জানুয়ারী থেকে শুরু হয় আর সমাপ্ত হয় ৩১ ডিসেম্বর। বছরের শুরুতেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) কর্তৃক নববর্ষের ঘোষণা হয়ে থাকে। নববর্ষের ঘোষণার পর থেকে প্রতিটি সদস্যের নিকট থেকে ওয়াদা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে যে, এ খাতে কে, কত টাকা দিতে চায়। স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ বা আমীর / প্রেসিডেন্ট সাহেব অংগ সংগঠনের সহযোগিতা নিয়ে এ কাজগুলি করে থাকেন। আশা করা যায় যে, প্রত্যেকেই এই ওয়াদায় শামিল হবে, এমনকি শিশুরাও, ওয়াদার পরিমাণ যত নগণ্যই হোক না কেন। আর এটাও স্মরণে রাখা উচিত মু'মিনের কদম আগে বাড়ে তাই পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছু বাড়তি লিখানো উচিত। এভাবে একটি তালিকা করে এক কপি ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ বরাবর বা ন্যাশনাল আমীর সাহেব বরাবর প্রেরণ করতে হয়। ওয়াদার এক কপি নিজ জামাতে রাখতে হয় যেন এটা দেখে দেখে বছরের বিভিন্ন সময় চাঁদা আদায় করা যায়।

'ওয়াকফে জাদীদ' চাঁদার ওয়াদা ও আদায়ের পদ্ধতি ঃ

'ওয়াকফে জাদীদের' ওয়াদার পরিমাণ কত হবে? ওয়াদার তালিকা করতে গেলে এ প্রশ্নটি প্রায়ই উত্থাপিত হয়। ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার ওয়াদা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা এসেছে। সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রথম এ তাহ্‌রিক এর চাঁদার হার বাৎসরিক ৫ (পাঁচ) টাকা ছিল। তারপর এর নিম্নতম হার ধার্য করা হয় মাত্র ১২ (বার) টাকা। পরবর্তীতে এর হার হয় ৭০ টাকা যখন পাউন্ড এর মান ৭০ (সত্তর) টাকা ছিল। অনেকের ওয়াদা হিসাবে আবার এক সময় মাসিক আয়ের ১০ (দশ) ভাগের ১ (এক) ভাগ বৎসরে দেয়া হতো। তবে সর্বশেষ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এই চাঁদার ওয়াদা গ্রহণ করাকে ঐচ্ছিক করে দিয়েছেন। তাই এখন আর এই চাঁদার ওয়াদার পরিমাণ বা নির্ধারিত হার নেই। তবে আশা করা যায় যে, মু'মিনের কদম দিন দিন সামনে চলবে। যারা যে পরিমাণের ওয়াদা এর পূর্বে লিখে আসছেন পিছনে গেলে কেমন যেন একটু শান বা মর্যাদাকে আঘাত আসে তাই এ সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকের বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়া ভালো। কম বেশি যাই হোক না কেন শিশু এবং নও মোবাঈনদেরও ওই খাতে ওয়াদা করানো উচিত যেন বরকত লাভ করতে থাকে। তবে বুঝিয়ে দিতে হবে কেন এই ওয়াদা? আর এর বরকতের দিকগুলো কি?

তবে ওয়াদা বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার সাথে আর একটি দিক বুঝানো উচিত আর তা হলো এই যে, আল্লাহ্‌র ফযলে যাদের বাজেট আছে– আয় আছে– চাঁদা দানে অভ্যস্থ হয়ে গেছে তারা পূর্বের মান অনুযায়ী ওয়াদার বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন। আর অপারগতা ও যাদের আয় নেই বা বাজেট হয় নাই বা শিশু বা নও মোবাঈন তাদের ক্ষেত্রে তাদের যা ইচ্ছা এটা দ্বারা উৎসাহিত করা দরকার। তাহলে আশা করা যায় যে, একটি ভাল ওয়াদা পাওয়া যাবে ।

যে যেমনটি ওয়াদা করেন সে অনুযায়ী আদায় হওয়া জরুরী। এর জন্য আদায় এর প্রচেষ্টা বছরের শুরু থেকে নেওয়া উচিত। সাধারণত আদায় এর জন্য মাসে মাসে এলান দেয়া জরুরী, বিশেষ করে জুমুআতে। তাছাড়া বছরে ৩/৪ বার চাঁদা আদায়ের জন্য আশারা (দশ দিনের চাঁদা আদায় কর্মসূচী) পালন করা যায়। ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা অনেক বেশি পরিশোধ রমযান মাসে হয়ে থাকে। আর রমযানে পরিশোধ করলে দোয়ার জন্য তালিকা প্রেরণ করা হয় হুযূর (আইঃ) এর সমীপে। তাই এ সুযোগ অনেকে গ্রহণ করে থাকে।

এ ব্যাপারে ওয়াকফে জাদীদ বিভাগের সেক্রেটারী সাহেবকে বেশ সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয় যেন ওয়াদাকারীগণ নিজেদের বিষয় অবগত হয় ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। তাছাড়া প্রতি বছর যখন অর্থ বছর শেষ হতে থাকে তখন কারো ওয়াদা বকেয়া পড়ে যাচ্ছে কিনা তা পূর্বে অবহিত করানো দরকার হয়ে পড়ে। এভাবে চাঁদা আদায়কালে বা চাঁদার ওয়াদার অবস্থা জানানোর সময় একটু বুঝিয়ে দেয়া ভালো যে ওয়াকফে জাদীদ কি? চাঁদা কেন ইত্যাদি। তাই তরবিয়তী

আলোচনা সভা বা ব্যক্তিগত যোগাযোগে হুযূর (আইঃ) কর্তৃক ওয়াকফে জাদীদ বিষয়ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা উচিত। এসব করলে আশা করা যায় ওয়াকফে জাদীদ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হবে। ফলে ওয়াদা ও আদায় বাড়বে। আর এভাবে ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে কদম বাড়তে থাকবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

ওয়াক্‌ফে জাদীদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ঃ

ওয়াকফে জাদীদ প্রতিষ্ঠা কত যে গুরুত্বপূর্ণ তা প্রতিষ্ঠালগ্নে অর্থাৎ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৭ইং এর সন্নিকট সময়ে আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন, এ তাহ্‌রিক (ওয়াকফে জাদীদ) কে জারি রাখার জন্য যদি তাঁর (রাঃ) গায়ের কাপড়-চোপড়ও বিক্রি করতে হয়, তা তিনি (রাঃ) করবেন। তবে মহান আল্লাহ্‌পাকের অশেষ ফযলে আহমদী বন্ধুগণ এ তাহ্‌রিককে গুরুত্ব দিয়ে এত এগিয়ে নিয়েছেন যে, হুযূর (রাঃ) এর জামা কাপড় বিক্রি করতে হয়নি।" (আল্লাহ্ তাদের কুরবানি কবুল করুন)।

এ প্রসঙ্গে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন, ওয়াকফে জাদীদের প্রসঙ্গ যখন 'প্রথম বছর ঘোষণা করা হয়েছিল তখন আমার স্মরণ আছে ষাট বা সত্তর হাজার টাকার ওয়াদা ছিল। এর পরে আমরা চেষ্টা ও জোর দিতে থাকি এবং খোদার আশীষক্রমে প্রত্যেক বছর এ তাহ্‌রিক সম্মুখে বাড়তে থাকে।" (জুমুআর খুতবা ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯২)।

আসলে ওয়াকফে জাদীদ প্রতিষ্ঠার মূল গুরুত্ব সকলে এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদি ওয়াকফে জাদীদকে সঠিকভাবে ধরে রাখা সম্ভব না হয় তবে জামাতী সদস্য বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তালীম ও তরবিয়ত ও নতুন আহমদীয়তের তালীম ও তরবিয়ত ব্যাহত হবে। তাই নিজেদের তাগিদেই সকলে এটা উপলব্ধি করে ওয়াকফে জাদীদকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়াও এর আরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে যেমন, (১) **শিশুদেরকে কুরবানি করার স্পৃহা জাগরিত করে ঃ** খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৬৬ ইং সনে ঘোষণা করেন, "কোন তিফল (শিশু) যেন এতে অংশগ্রহণ থেকে বাদ না থাকে।" এর জন্য রাবওয়াতে দফতর আতফাল নামে একটি দফতর খোলা হয়েছে।

(২) **ওয়াদার পরিমাণের চেয়ে সংখ্যার গুরুত্ব দেয়া হয় ঃ** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) বলেন, - "এ তাহ্‌রিকে দেশগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে অংশগ্রহণের সাথে যতটা সম্পর্ক তাতে সবাই মিলে কত বেশি সংখ্যক লোক খোদার পথে আর্থিক কুরবানিতে অংশগ্রহণ করে। শিশু, মহিলা, পুরুষ, বৃদ্ধ, ছোটরাও তদনুযায়ী তাদের প্রদত্ত অর্থ সৌভাগ্যবান হিসাবে আনন্দের সাথে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।" (জুমুআর খুতবা ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৯)।

(৩) **সর্ব সাধারণের পর্যায় থেকে ওলী-আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ঃ**

ওয়াকফে জাদীদ এর ফলে সর্বত্র ওলী আল্লাহ্ পয়দা করার প্রক্রিয়া সমন্নত করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) ওয়াকফে জাদীদের সম্পর্ক ওলী আল্লাহ্ হওয়ার সাথে যা কিনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলে গেছেন এবং যে চিত্র এঁকে দেন তার এ আধ্যাত্মিক স্বপ্নের তা এই যে, স্থানে স্থানে বড় আওলিয়া ও কুতুবগণ জন্ম নিচ্ছেন। তাই ওয়াকফে জাদীদের তাহরিক তো নিছক একেবারে সাধারণ কিন্তু পার্থিব জগতের নয় ধর্মের দিক থেকে পটভূমি গ্রামীণ দিক থেকে তাকালেও কিন্তু যে উদ্দেশ্য ছিল তা এই যে, গ্রামে-গঞ্জে, রাজী'র (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তোষ্ট) মতো লোক জন্মগ্রহণ করা আরম্ভ করুক।" (জুমুআর খুতবা ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬ইং)।

এ ভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দিন দিন এর অগ্রগতি হয়ে চলেছে। একটি স্বপ্নের বর্ণনায় ও ওয়াকফে জাদীদকে অগ্রগামী দেখা যায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) বর্ণনা করেছেন, মারিশাসের আব্দুল গণি নামক নিষ্ঠাবান ওয়াকফে জিন্দেগী এক যুবক স্বপ্ন দেখলেন; তিনি বলেছেন; "আমি আহমদীয়া জামাতকে একটি টেবিলের মতো দেখলাম যার পা খুব দ্রুত বেগে চলছে। এমনকি যে, দেখতে দেখতে ওয়াকফে জাদীদের পাগুলো খুবই দ্রুত বেগে চলতে আরম্ভ করলো। তাহ্‌রিকে জাদীদের পাগুলি পুরাপুরি চেষ্টার সাথে পাল্লা দিলো কিন্তু পারলো না। তখনই হঠাৎ আমি দেখি যে, তাহ্‌রিকে জাদীদের পায়ে কথা বলার শক্তি সৃষ্টি হলো আর বললো; থামো, আমি তখন আর এথেকে অধিক সহ্য করতে পারছি না, তোমার দ্রুততা কমিয়ে ফেলো, ধীরে চলো। উত্তরে ওয়াকফে জাদীদের পা বললো, এখন আমার থামা সম্ভব নয়। আমি আমার নিজের প্রচেষ্টায় বাড়ছি না। আমাকে তো অগ্রসরমান থাকতেই হবে।"

এর ব্যাখ্যা হযূর রাবে (রাহেঃ) করেছেন, "চাঁদার আকারে দৃষ্টিতে চলে এসেছে যে, বিগত বছরগুলোতে তাহ্‌রিক জাদীদের যতটা প্রবৃদ্ধি হয়েছে তদপেক্ষা এর প্রবৃদ্ধি (ওয়াকফে জাদীদের) বেশি।" (জুমুআর খুতবা ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ইং)।

ওয়াকফে জাদীদের প্রয়োজনীয়তা ঃ

ওয়াকফে জাদীদ এর প্রয়োজনীয়তা থেকে এর প্রসারতা লাভ হয়েছে। আর এই ব্যাপকভাবে প্রসারিত হওয়াটাই প্রমাণ করে কত বেশি এর প্রয়োজন। প্রথম এর প্রতিষ্ঠাকালে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলো পাকিস্তানের 'থর' নামক এলাকায়। হুযূর রাবে (রাহেঃ) উল্লেখ করেন, ... "ওয়াকফে জাদীদের যে বছরে সূচনা হয়েছে এ পর্যায়েই খৃষ্টানরা আমেরিকা থেকে অসাধারণ সাহায্য পাচ্ছিল, থর এলাকার বাসিন্দাদের খৃষ্টান বানানোর আগ্রাসনের জন্য এবং এদিক থেকে এই ঐশী তাহ্‌রিক বিশেষভাবে তাৎপর্য অবলম্বন করে যাচ্ছে যে, যদি ওয়াকফে জাদীদের তাহ্‌রিক না হতো এবং আহমদী জামাতের 'থর' এলাকায় সেবা করার সুযোগ না হতো তাহলে সেখানে তীব্র গতিতে খৃষ্টান মতবাদ ছড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু খোদাতাআলার আশীসে সঠিক সময়ে এ তাহারিক এর ফলে যখন আমরা মোয়াল্লিমগণকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য খবর নিচ্ছিলাম তখন জানা গেল যে, 'থর'

এলাকায় এর খুবই প্রয়োজন ছিল।" (জুমুআর খুতবা ৪ জানুয়ারী, ১৯৯১ইং)।

এখানে ওয়াকফে জাদীদ এর মূল দিক তুলে ধরে বলা হচ্ছে মুয়াল্লিম বাহিনী যথাযথভাবে প্রেরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে তবলীগ ও তরবিয়তের মান বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আল মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বলেন, "যেহেতু অনেক জমির মালিক জমির কিছু কিছু অংশ ওয়াকফ করবেন এবং মুয়াল্লিমগণকে আমরা সামান্য ভাতা দিব। ঐসব জমি থেকে কিছু অধিক আয় হবে তাতে আর্থিক ব্যাপারে চিন্তার কোন কারণ নেই।"

এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) "এ তাহ্রিকের ফলে আল্লাহ্তাআলার আশীসে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) যতটা আশা করেছিলেন তার চেয়ে অধিক ওয়াদা জামাত করেছিলেন। আর প্রথমে কতকগুলো কেন্দ্রের (Posting এর স্থান) ঘোষণা করা হলো যে, ওয়াকফে জাদীদের মুয়াল্লিমগণের সেখানে Posting এ থাকবেন। কিন্তু তার তুলনায় অধিক Centre (স্থান) স্থাপন করার খরচাদী যোগাড় হয়ে গেল" (জুমুআর খুতবা ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯১ইং)।

এভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ওয়াকফে জাদীদের বিভিন্ন প্রয়োজন বা মুয়াল্লিমগণের ভাতা বা Posting-এর ক্ষেত্রে T.A. ও D.A. প্রয়োজন কখনও অপূরণ থাকেনি। আজও আল্লাহ্র ফযলে বৃদ্ধিসহ এভাবেই দ্রুত চালু রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। আর এসব প্রয়োজন ও অগ্রগতি উপলব্ধি করেই হয়ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) ১৯৮৫ইং সালে এ তাহ্রিককে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি (রাহেঃ) বলেছেন ঃ

"প্রথম যুগে এ তাহ্রিক কেবলমাত্র হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান (বাংলাদেশ) এর জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর বিশ্বব্যাপী জামাতের অসাধারণ অগ্রগতি ও বিস্তারকে সামনে রেখে আমি ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫ইং তারিখে এ তাহ্রিককে সারা পৃথিবীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আজ আল্লাহ্র ফযলে ১১১টি দেশের (বর্তমানে ১২৪টি দেশের) আহমদী এ তাহ্রিকে শামিল হয়েছে।" (জুমুআর খুতবা ৩ জানুয়ারী, ২০০৩ইং)।

আল্লাহ্পাকের খাস ফযলে উত্তরোত্তর ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদাকারীও বেড়ে চলেছে বর্তমানে ওয়াদাকারী ৪ (চার) লক্ষ ৮ (আট) হাজার জন। নতুন প্রজন্মের তালীম, কুরআন শিক্ষা, ইসলামী মূল্যবোধ মৌলিক বিষয়াবলীর শিক্ষার জন্য এখন মুয়াল্লিম ওয়াকফে জাদীদ এর বিকল্প নেই। তদুপরী বর্তমানের বিভিন্ন প্রয়োজনে ওয়াকফে জাদীদ জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত হয়েছে। প্রতিটি জামাত (স্থানীয়) একজন মুয়াল্লিম চায় এথেকে বুঝা যায় এর চাহিদাও যথেষ্ট। তাছাড়া সত্য কথা হলো মুয়াল্লিমগণ তালীম, তরবীয়ত, স্থানীয় তালীম, রাবেতা ইত্যাদি কার্যক্রম ছাড়াও একটি জামাতের সার্বিক কল্যাণমূলকত কাজে অংশগ্রহণ করে চলেছেন। বিধায় এর এত বেশি প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেও আমাদের আর পিছিয়ে থাকাটা ঠিক হবে না। অতীতের যত দুর্বলতা আছে ঝেড়ে ফেলে সামনে এগুনোর জন্য বছরের শুরু যখন হয় তখন থেকে ওয়াদা, আদায় ও কার্যক্রম ব্যাপকভাবে চালু করে দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়া দরকার। মহান আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে ওয়াকফে জাদীদের মূল বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি করার দান করুন। যেভাবে আল মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এক নযমে বলেছেন ঃ

হো ফযল তেরা ইয়া রাব্ব ইয়া কোই ইবতেলা হো

রাজি হ্যায়ঁ হাম উসিমে জিসমে তেরী রেজা হো।

হে প্রভু প্রতিপালক তোমার অনুগ্রহ বা কোন পরীক্ষা হোক না কেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট যাতে তোমার সন্তুষ্টি বিরাজমান।

যদি আমরা আমাদের সকল চাওয়া-পাওয়াকে এভাবে খোদার জন্য উৎসর্গ করতে পারি তখনই আমাদের ওয়াকফে জিন্দেগী সার্থক হবে। আর এভাবেই ওয়াকফে জাদীদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আল্লাহ্ এমনটি করুন, আমীন।

- এনামুল হক রনি

শোক সংবাদ

জনাব আজগর আলী খাঁন গত ২৬/১১/২০০৪ইং রোজ শুক্রবার ভোর রাত ২.২০ মিঃ নিজ বাসবভন পশ্চিম পাইকপাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে ও ৫ মেয়ে, নাতী, নাতনীসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুম ৮ বৎসর বয়সে পাকিস্তান যান। দীর্ঘ ১৫ বছর তিনি রাবওয়াতে লেখা পড়া করেন। উর্দূ ভাষায় তিনি সাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। বাংলাদেশে চট্টগ্রামে দীর্ঘ দিন কর্মরত ছিলেন। কর্মশেষে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে নিজ বাড়িতে অবস্থান করেন। মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি সুস্থ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাকেও কষ্ট দেন নাই বা নিজেও কোনরূপ অসহনীয় কষ্ট ভোগ করেন নাই। মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনার জন্য সকল আহমদী ভাই বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাত তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে।

আল্লাহ্ যেন তাকে বেহেস্ত নসীব করেন এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে "সাবরে জামিল" দান করেন।

আলহাজ্ব শেখ মোশাররফ হোসেন
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

■ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মোঃ মাহতাব উদ্দিন আহমদ সাহেব গত ২১শে নভেম্বর রোজ রবিবার রাত ১০.৩০ মিনিট সময়ে তাঁর নিজ বাসভবনে দক্ষিণ আহমদী পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। মরহুমের জানাযার নামাজ পড়ান মওলানা এনামুল হক (রনি) সাহেব, মোয়াল্লেম। মরহুম স্ত্রী, তিন পুত্র, ছয় কন্যা সহ বহু নাতি-নাতনী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত লাভের জন্য এবং জান্নাতে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহ্তাআলা যেন আমাদের পরিবারবর্গকে "সাবরে জামিল" দান করেন সেই জন্যও সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ মাহবুবুর রহমান

The AHMADI Bulletin 15-31 December, 2004
(Published for Talim and Tarbiyyat for the Members of Ahmadiyya Muslim Jamaat)

ঈদুল ফিতরের সময় বায়তুল ফুতূহ্ মসজিদ (লন্ডন) প্রাঙ্গনে খোদ্দামুল আহমদীয়া স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের ২৭তম ইজতেমায় পতাকা উত্তোলন ও দোয়া

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ মাহবুব হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশাআত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর পক্ষে
আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকসি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মুদ্রিত
Printed and Published by Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat at Ahmadiyya Art Press,
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211